গণদাবী

সোস্যালিস্ট ইউনিটি সেন্টার অফ ইন্ডিয়া (কমিউনিস্ট)-এর বাংলা মুখপত্র (সাপ্তাহিক)

৭৬ বর্ষ ৩৫ সংখ্যা | ১৯- ২৫ এপ্রিল ২০২৪ | Web: https://ganadabi.com | আট পাতা | মূল্য ঃ ৩ টাকা | পৃ. ১

দেশে বামপন্থী দলগুলির মধ্যে

সবচেয়ে বেশি আসনে লড়ছে এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট)

১৫ এপ্রিল কলকাতায় দলের কেন্দ্রীয় দফতরে এক সাংবাদিক সম্মেলনে রাজ্য সম্পাদক কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, ১৯ এপ্রিল থেকে যে সাধারণ নির্বাচন হতে চলেছে তাতে আমরা এ রাজ্যে ৪২টি আসন সমেত ১৯টি রাজ্য ও ৩টি কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলে মোট ১৫১টি আসনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছি, যা একক বামশক্তি হিসাবে সবচেয়ে বেশি রাজ্যে সবচেয়ে বেশি আসন। কিন্তু সিপিএম 'ইন্ডিয়া' নামক জোটের অন্তর্ভুক্ত হয়ে দক্ষিণপন্থী শক্তির হাতেই মূলত নিজেকে সমর্পণ করেছে। একমাত্র আমরাই গণআন্দোলনের শক্তি হিসাবে গোটা দেশে বিপ্লবী বামপন্থার ঝান্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে রেখেছি।

এ রাজ্যে ক্ষমতাসীন তৃণমূল কংগ্রেস বাস্তবে নিম্নতম স্তর থেকে সর্বোচ্চ স্তর পর্যন্ত দুর্নীতিতে নিমজ্জিত। এই দল অতীতে কংগ্রেস, পরবর্তী কালে সিপিএমের ছেড়ে যাওয়া জুতোয় পা গলিয়ে গণতন্ত্রকে হত্যা করছে, আন্দোলনের অধিকার কেড়ে নিচ্ছে, বিরোধী কণ্ঠস্বর দমন করছে, পুলিশ, প্রশাসন, সশস্ত্র গুন্ডাবাহিনী ও টাকার জোরে ভোট জালিয়াতি করে এবং দল-বদলের নিকৃষ্টতম রাজনীতির মধ্যে দিয়ে পঞ্চায়েত থেকে শুরু করে সংসদীয় গণতন্ত্রের সমস্ত স্তরকে বিরোধী-মুক্ত করার উন্মত্ত খেলায় নেমেছে। শিক্ষক নিয়োগ ও অন্যান্য নিয়োগ দুর্নীতি, রেশন দুর্নীতি, পঞ্চায়েতের সুযোগ-সুবিধা বণ্টনে দুর্নীতি, জব-কার্ডের মজুরি দুর্নীতি ইত্যাদি হাজার দুর্নীতিতে এই দলের নেতারা অভিযুক্ত।

বিজেপি প্রসঙ্গে তিনি বলেন, 'ভ্রষ্টাচার-মুক্ত' ভারত প্রতিষ্ঠার প্রতিশ্রুতি দিয়ে কেন্দ্রে ক্ষমতাসীন যে বিজেপি সমস্ত বৃহৎ বিরোধী দলগুলির বিরুদ্ধে ইডি, সিবিআই, এনআইএ প্রভৃতি কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে নগ্নভাবে ব্যবহার করছে, সেই বিজেপি ইলেক্টোরাল বন্ডের ৬০৬০ কোটি টাকা আত্মসাৎ করে 'বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারি'-তে জড়িত, 'পিএম কেয়ারস' ফান্ডের কোনও হিসাব দেয়নি, মধ্যপ্রদেশের 'ব্যাপম' কেলেঙ্কারির মতো নিকৃষ্টতম দুর্নীতির সঙ্গে এই দল জড়িত। অভিযোগ, ২০১৯-এ পুলওয়ামা বিস্ফোরণের ঘটনায় সিআরপিএফ জওয়ানদের প্রাণহানির আশঙ্কা জানা থাকা সত্ত্বেও বিজেপি সরকার চুপ করে ছিল যাতে এই ঘটনাকে ভোটে ব্যবহার করা যায়। তিনি বলেন, কালো টাকা উদ্ধারের কথা শুনিয়ে নোট-বন্দির নামে শতাধিক মানুষের প্রাণহানির জন্য প্রধানমন্ত্রী সরাসরি দায়ী।

সাতের পাতায় দেখুন

রাজ্য জুড়ে চলছে দলের প্রার্থীদের প্রচার

পুরুলিয়া কেন্দ্রে প্রার্থী কমরেড সুস্মিতা মাহাত কথা বলছেন স্থানীয় মানুষের সঙ্গে

মালদহ উত্তর ও দক্ষিণ কেন্দ্রের প্রার্থী যথাক্রমে কমরেড কালীচরণ রায় ও কমরেড অংশুধর মণ্ডলের সমর্থনে মিছিল

বেকারদের কথা ভুলেই গেল মোদি সরকার !

২০১৪ সালে প্রথমবার কেন্দ্রীয় সরকারে আসীন হওয়ার আগে নরেন্দ্র মোদি বুক বাজিয়ে বলেছিলেন— ক্ষমতায় এলে বছরে ২ কোটি বেকারকে চাকরি দেবেন। সে বছর বিজেপির নির্বাচনী ঘোষণাপত্রেও লেখা হয়েছিল, সরকারে বসে কাজের সুযোগ সৃষ্টি করাই হবে তাদের অন্যতম প্রধান দায়িত্ব। দশ বছর ধরে কেন্দ্রে বিজেপি শাসনের পর দেখা যাচ্ছে বেকারত্ব কমাতে তথা কর্মসংস্থান সৃষ্টিতে নরেন্দ্র মোদির সরকার ডাহা ফেল করেছে। শুধু এটুকুই নয়, এই দশ বছরে প্রকৃত মজুরি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই একই জায়গায় দাঁড়িয়ে থেকেছে, কোনও কোনও ক্ষেত্রে আগের বছরের তুলনায় কমেও গেছে। আরও সমস্যার কথা হল, দেখা যাচ্ছে কর্মসংস্থান বা মজুরি সংক্রান্ত তথ্য সরকার অনেক সময়ই প্রকাশ করছে না, গোপন করার চেষ্টা করছে। যেটুকু তারা প্রকাশ্যে আনছে, সেগুলি আবার অর্থনৈতিক বিশেষজ্ঞদের তৈরি নানা রিপোর্ট বা খ্যাতনামা গবেষণাকেন্দ্রগুলির দেওয়া তথ্যের সঙ্গে মিলছে না।

বেকারত্বের হার

কেন্দ্রে বিজেপি ক্ষমতায় বসার পর ৩ বছরের মধ্যে গত ৪৫ বছরের রেকর্ড ভেঙে ২০১৭-'১৮-তে বেকারত্বের হার পৌঁছেছিল ৬.১ শতাংশে। এরপর কোভিড অতিমারির বছরে ২০২০-র এপ্রিল থেকে জুনে এই হার আরও ২০.৮ শতাংশ বেড়ে যায়। মোদি সরকারের দাবি— ২০২২-'২৩-এ বেকারত্বের হার কমে ৩.২ শতাংশে দাঁড়িয়েছে। যদিও 'সেন্টার ফর মনিটরিং ইন্ডিয়ান ইকনমি' (সিএমআইই), যার গবেষণালব্ধ রিপোর্টগুলিকে অর্থনীতিবিদ ও গবেষকরা প্রামাণ্য বলে ভরসা করেন, তাদের গবেষণা বলছে, সরকারি হিসাবের চেয়ে বাস্তবে বেকারত্বের হার অনেকটাই বেশি। দেশের ঘরে ঘরে আজ বেকার যুবক-যুবতীদের হাহাকার স্পষ্ট করে দেয়

দুয়ের পাতায় দেখুন

কে বড় দুর্নীতিবাজ তারই প্রতিযোগিতা চলছে

কোচবিহারের নির্বাচনী জনসভায় ৪ মার্চ প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি বলেছেন, তিনি কড়া হাতে দুর্নীতি দমন শুরু করেছেন। হুঙ্কার দিয়ে বলেছেন, মোদি দুর্নীতিগ্রস্তদের সাজা দিয়েই ছাড়বে। উত্তরপ্রদেশের মিরাটেও এক নির্বাচনী জনসভায় তিনি এ কথা বলেছেন। নিজেকে তিনি দুর্নীতি বিরোধী মহাযোদ্ধা রূপে তুলে ধরার আপ্রাণ চেষ্টা করছেন। কিন্তু বাধ সাধছে তার নিজেরই তৈরি কোম্পানি আইন সংশোধনী। এই সংশোধনীটি তিনি ২০১৭ সালে এনেছিলেন, যাতে পুঁজিপতিদের থেকে কোটি কোটি টাকা পার্টি ফান্ডে নেওয়া যায়।

অবশ্য ভোট প্রচারে গিয়ে কংগ্রেস এবং তৃণমূল নেতারাও দুর্নীতির বিরুদ্ধে হুঙ্কার দিচ্ছেন। কিন্তু লক্ষণীয় হল, তিন দলের প্রচার মন দিয়ে শুনলেই বোঝা যায়— তারা অন্য দলকে নিজেদের চেয়ে বড় দুর্নীতিবাজ বলে ঘোষণা করছেন। নিজেরা কোনও দুর্নীতি

চারের পাতায় দেখুন

বেকারদের কথা ভুলেই গেল মোদি সরকার!

একের পাতার পর

যে, সরকার এ বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রকাশ করছে না।

তা ছাড়া এ প্রশ্ন না উঠে পারে না যে, বাস্তবে বেকারত্বের হার যদি সত্যিই কমে থাকে, তাহলে মোদি সরকার ২০১৭ সালের 'এমপ্লয়মেন্ট আনএমপ্লয়মেন্ট সার্ভে'-র বার্ষিক রিপোর্ট চেপে দিয়েছিল কেন? কেনই বা তারা ২০১৮ সালে 'লেবার ব্যুরো'-র ত্রৈমাসিক সমীক্ষা বন্ধ করে দিল?

কমছে উৎপাদন ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান

২০১৪ সালে 'মেক ইন ইন্ডিয়া' প্রকল্প নিয়ে বিজেপির নেতা-মন্ত্রীরা ব্যাপক ঢাক-ঢোল পিটিয়েছিলেন। ২০২০-তে তাঁরা আবার নিয়ে এলেন 'আত্মনির্ভর ভারত' প্রকল্প। দুটি প্রকল্পেরই নাকি উদ্দেশ্য ছিল উৎপাদন ক্ষেত্রকে উৎসাহ দেওয়া। এই দুই প্রকল্পে শ্রমিক-নির্ভর কাজের ব্যবস্থা করে বেকারত্ব কমানোর ব্যবস্থা হবে বলে ২০১৪ ও '১৯-এর নির্বাচনী ঘোষণাপত্রে দাবি করেছিল বিজেপি। বাস্তবে দেখা গেল, দুটি প্রকল্পই ব্যর্থ হয়েছে। ২০১৬-র তুলনায় ২০২১-এ উৎপাদন ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ অর্ধেক হয়ে গেছে। অর্থনীতিবিদরা বলছেন, এমনকি কোভিড অতিমারির সময়ের তুলনাতেও বর্তমানে এই ক্ষেত্রে কাজের সুযোগ কম। যে ক'জন কাজ পেয়েছেন, ২০১৮-র একটি সমীক্ষা দেখাচ্ছে, তাদের বেশির ভাগেরই মজুরি নিতান্ত কম।

পরিকাঠামো ক্ষেত্রেও কাজ নেই

দেশের প্রায় ৭ কোটি মানুষ পরিকাঠামো ও গৃহনির্মাণ ক্ষেত্রে কাজ করেন। কিন্তু উদ্বেগের বিষয় হল, এখানে অধিকাংশ কর্মীরই কাজ স্থায়ী নয়। 'লেবার সার্ভে রিপোর্ট'-এর সমীক্ষা অনুযায়ী, এই ক্ষেত্রে ৮৩ শতাংশেরও বেশি কর্মী ঠিকা-শ্রমিক হিসাবে কাজ করেন। অর্থাৎ আজ তাঁদের কাজ থাকলেও কাল থাকবে কি না, নিশ্চিত নয়।

কৃষি মজুরিতেই আটকে অধিকাংশ

বিজেপি সরকার এই বিষয়টি নিয়ে অবশ্য গর্ব করতেই পারে। ঢাক পিটিয়ে তারা বলতে পারে, ২০১৮-'১৯-এ ৪২.৫ শতাংশ থেকে বেড়ে ২০২১-'২২-এ কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থানের হার হয়েছে ৪৫.৫ শতাংশ। যদিও অর্থনীতিবিদদের মতে কৃষিক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধি পাওয়া সার্বিক ভাবে অর্থনীতির অবনমনের চিহ্ন। তাঁরা বলছেন, শহরে কাজ করতে আসা মানুষ কাজের অভাবে গ্রামমুখী হওয়ার কারণেই এই বৃদ্ধি।

স্বনিযুক্তি ঃ কাজ আছে মজুরি নেই

দেখা যাচ্ছে, নরেন্দ্র মোদির প্রধানমন্ত্রীত্বের দশ বছরে দেশে স্বনিয়োজিত মানুষের সংখ্যা বেড়েছে। এঁদের অধিকাংশই নিজের ঘরে বসে কেউ হাতের কাজ করে, কেউ বা সবজি বিক্রি করে অথবা চায়ের দোকান খুলে কিছু রোজগারের চেষ্টা করেন। ২০১৩-'১৪-তে ৪৯.৫ শতাংশের তুলনায় ২০২২-'২৩-এ এমন স্বনিয়োজিত মানুষের সংখ্যা বেড়ে হয়েছে ৫৭.৩ শতাংশ। অনেকখানি বৃদ্ধি সন্দেহ নেই। কিন্তু অর্থনীতি বিশেষজ্ঞরা এতে আশঙ্কার কালো ছায়া দেখছেন। প্রথমত অন্য কোথাও কাজ না পেয়েই মানুষ সাধারণত এই ধরনের নিতান্ত কম আয়ের কাজে নিযুক্ত হন। তা ছাড়া এই ক্ষেত্রে এমন বহু মানুষ কাজ করেন যাঁরা অন্যকে মজুরি দেন না, নিজেও মজুরি পান না। এঁদের অনেকেই নিজেই উৎপাদক, নিজেই বিক্রেতা এবং এই কাজের জন্য তাঁদের কোনও মজুরি নেই। মজুরি ও মাস-মাইনের স্থায়ী কাজের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং স্বনিয়োজিত কর্মীর সংখ্যা হ্রাস— অর্থনীতির উন্নয়নের এ হল একটি প্রধান লক্ষণ। ফলে স্বনিয়োজিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান বৃদ্ধির এই ঘটনাই গোটা দেশ জুড়ে কর্মহীনতার বিপুল সংকটের চেহারাটা চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়।

প্রকৃত মজুরি একই জায়গায় থেকে যাওয়াও উদ্বেগজনক। হিসাবে দেখা যাচ্ছে ২০১৪-'১৫-র তুলনায় ২০২১-'২২-এ প্রকৃত মজুরি অর্থাৎ মূল্যবৃদ্ধির নিরিখে মজুরির পরিমাণ ১ শতাংশেরও কম বেড়েছে। বিজেপির ঘোষণাপত্রগুলিতে যে কৃষি ও নির্মাণশিল্পে জোর দেওয়ার কথা বলা হয়েছিল, এই সময়ে সেই দুটি ক্ষেত্রে প্রকৃত মজুরি বেড়েছে মাত্র ০.৯ শতাংশ ও ০.২ শতাংশ। অথচ এই সময়কালে ব্যাপক মূল্যবৃদ্ধির আগুনে পুড়েছেন, এখনও পুড়ে চলেছেন খেটে-খাওয়া সাধারণ মানুষ। সব মিলিয়ে ২০২০-র একটি গবেষণা থেকে দেখা যাচ্ছে, বিজেপির শাসনকালে মজুরি বৃদ্ধির হার থমকে গেছে, বহু ক্ষেত্রে তা তুলনামূলক ভাবে কমেও গেছে। ২০২২-'২৩-এর ইকনমিক সার্ভে রিপোর্টে খোদ কেন্দ্রীয় সরকারই জানিয়েছে, গ্রামীণ এলাকায় প্রকৃত মজুরি বৃদ্ধির হার ঋণাত্মক।

'ইনস্টিটিউট ফর হিউম্যান ডেভেলপমেন্ট' ও 'ইন্টারন্যাশনাল লেবার অর্গানাইজেশন' (আইএলও)-র যৌথ গবেষণায় তৈরি 'ইন্ডিয়া এমপ্লয়মেন্ট রিপোর্ট ২০২৪' ও কর্মসংস্থানের বেহাল দশাটিকে তুলে ধরেছে। গবেষকরা হিসাব করে দেখিয়েছেন, ভারতে শ্রমের বাজারে অসংগঠিত ক্ষেত্রেরই রমরমা। তাঁদের রিপোর্ট বলছে, দেশের কর্মক্ষম মানুষের ৮১ শতাংশই অসংগঠিত ক্ষেত্রে কাজ করেন। অর্থাৎ দেশের সংগঠিত ক্ষেত্রে কর্মসংস্থান নেহাৎ নগণ্য। রিপোর্ট আরও দেখিয়েছে, ভারতে কাজের বাজারের একটা বড় অংশ দখল করে রয়েছে স্বনিয়োজিত মানুষ। ২০২৩-এর হিসাবে তা মোট কর্মে নিযুক্ত মানুষের ৫৭.৩ শতাংশ। ঠিকা কর্মী যারা মূলত দিনমজুর হিসাবে কাজ করেন, তাঁরা দখল করে রয়েছেন মোট কর্মে নিযুক্ত মানুষের ২১.৮ শতাংশ। নিয়মিত ও স্থায়ী কাজ রয়েছে মাত্র ২০.৯ শতাংশের।

বছরে ২ কোটি বেকারের চাকরির প্রতিশ্রুতি যে আসলে 'জুমলা', তা বহুদিন আগেই দেশের মানুষের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে। নরেন্দ্র মোদির দশ বছরের শাসনে এ কথাও আজ পরিষ্কার যে, কর্মসংস্থান বা কাজের সুযোগ সৃষ্টি সংক্রান্ত তাঁর সরকারের যাবতীয় প্রতিশ্রুতিও আসলে জুমলাই। কিছু বাগাড়ম্বর ছাড়া তাঁর সরকার দেশের কোটি কোটি কর্মহীন যুবকের যন্ত্রণা লাঘবের কোনও ব্যবস্থাই করেনি, করার চেষ্টাও করেনি। ঘরে ঘরে কর্মহীন, উপার্জনহীন তরুণ-তরুণীদের চাপা কান্না আর তাদের পরিজনদের দীর্ঘশ্বাসে বাতাস ক্রমশ ভারি হয়ে উঠছে।

সম্প্রতি বিজেপি তাদের নির্বাচনী ঘোষণাপত্র প্রকাশ করেছে। নাম— 'মোদি কি গ্যারান্টি'। লক্ষণীয়, এই মুহূর্তে দেশের কঠিনতম সমস্যাগুলির অন্যতম বেকারত্ব নিয়ে এই ঘোষণাপত্র নীরব। বাস্তবে কর্মসংস্থান নিয়ে বিজেপির অতীতের সমস্ত প্রতিশ্রুতিই এমন ভাবে ব্যর্থ হয়েছে যে, নতুন করে একই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেওয়ার চেয়ে নীরব থাকাটাই বোধহয় তাঁরা ভালো মনে করেছেন।

(তথ্যসূত্র ঃ স্ক্রোল ডট ইন, ২১ মার্চ '২৪ ও ইন্ডিয়া টুডে, ১৫ এপ্রিল '২৪)

জীবনাবসান

এস ইউ সি আই (সি) কলকাতা জেলার অন্তর্গত বরানগর আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য (বিনু) বেশ কিছুকাল ধরেই স্নায়ুরোগে ভুগছিলেন। ৭ মার্চ রাতে সমস্যা দেখা দেওয়ায় তাঁকে প্রথমে স্থানীয় নার্সিং হোম ও তারপর সেখান থেকে পিজি হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। ঘুমের মধ্যেই তাঁর ব্রেন স্ট্রোক হয় এবং তিনি কোমায় চলে যান। তাঁর জ্ঞান আর ফেরেনি। ১০ মার্চ চিকিৎসকরা তাঁকে মৃত ঘোষণা করেন। তাঁর বয়স হয়েছিল ৬৪ বছর।

১৯৮৪-'৮৫ সাল নাগাদ তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের সংস্পর্শে আসেন। পরিবার সিপিএম প্রভাবিত হওয়া সত্ত্বেও সেই বাঁধন ছিঁড়ে এস ইউ সি আই (সি)-র বিপ্লবী রাজনীতি গ্রহণ করতে তাঁর অসুবিধা হয়নি। সর্বস্ব দিয়ে বিপ্লবী রাজনীতি করার মন তাঁর শুরু থেকেই ছিল। তিনি দলের প্রতিটি দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠার সঙ্গে পালন করতেন। তিনি অঞ্চলের যুব সংগঠন ডিওয়াইও-র সম্পাদকের পদ লাভ করেন এবং তাঁর এই একনিষ্ঠ কর্মী হওয়ার সুবাদেই তিনি দলের আঞ্চলিক কমিটির সদস্য হিসাবে মনোনীত হন। সর্বদা উৎসাহী, উচ্ছল, খোলা মনের মানুষ ছিলেন কমরেড শ্রীকান্ত। দলের ডাকে তিনি কোনও কিছুর তোয়াক্কা না করে ঝাঁপিয়ে পড়তেন। নাটক ও আবৃত্তি ছিল তাঁর পছন্দের বিষয়। পরিশ্রম করে তিনি দেওয়াল লিখনও শিখেছিলেন।

পরবর্তীকালে পারিবারিক সংকট ও চাপে তিনি সাংসারিক জীবনে কিছুটা আবদ্ধ হয়ে পড়েন। কিন্তু সে সময়ও পার্টির যে কোনও রাজনৈতিক কর্মসূচিতে তাঁর সক্রিয় অংশগ্রহণ বাদ যায়নি। সর্বক্ষণের কর্মী হিসাবে থাকতে পারেননি বলে তিনি দুঃখ-ব্যথা নিয়ে চলতেন।

তাঁর মৃত্যুসংবাদ পেয়ে কর্মী-সমর্থকদের মধ্যে শোকের ছায়া নেমে আসে। ৭ এপ্রিল দলের বরানগর কার্যালয়ে তাঁর স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর প্রতিকৃতিতে মাল্যদানের পর তাঁর স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে বক্তব্য রাখেন আঞ্চলিক কমিটির পূর্বতন সম্পাদক, জেলা কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড সাধন চক্রবর্তী, অঞ্চলের বিশিষ্ট প্রবীণ কর্মী ও কলকাতা জেলা কমিটির সদস্য কমরেড কাজল ভট্টাচার্য, বিশিষ্ট সংগঠক কমরেড পূর্ণ সামন্ত এবং আঞ্চলিক সম্পাদক কমরেড সুপ্রিয় ভট্টাচার্য।

কমরেড শ্রীকান্ত ভট্টাচার্য লাল সেলাম

খাল সংস্কারের দাবি কোলাঘাটে

পূর্ব মেদিনীপুরের কোলাঘাট ব্লকে বৃন্দাবনচক গ্রাম পঞ্চায়েতের পরমানন্দপুর থেকে শুরু হয়ে বর্তমানে বরদাবাড় বাজার এলাকার কো-অপারেটিভ পর্যন্ত সংস্কারের পর ঠিকাদার বেনিফিসিয়ারি কমিটির কাউকে না জানিয়ে ৩ এপ্রিল রাতে মেসিন নিয়ে চলে গিয়েছে। অথচ বাজার অংশে খাল সংস্কার করতে বাকি। খালের কয়েকটি জায়গায় ক্রস বাঁধের মাটি তুলতে বাকি। মানুষ এই ঘটনায় ক্ষুব্ধ। ওই খালের অবশিষ্টাংশ সহ মেন খাল দেহাটি ও চাপদা-গাজই খাল সংস্কারের দাবিতে পরবর্তী আন্দোলনের কর্মসূচি গ্রহণের উদ্দেশ্যে ৯ এপ্রিল উত্তর জিএণ্ডাদা হাইস্কুলে কৃষক সহ সব স্তরের জনসাধারণের এক জরুরি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তব্য রাখেন সংগ্রাম পরিষদের সম্পাদক নারায়ণ চন্দ্র নায়ক। সভাপতিত্ব করেন পরিষদের সভাপতি গোপাল সামন্ত। এ ছাড়াও সভায় উপস্থিত ছিলেন পূর্ব মেদিনীপুর জেলা বন্যা-ভাঙন প্রতিরোধ কমিটির সহ সভাপতি মধুসূদন বেরা। সভায় সেচ দপ্তরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার, জেলাশাসক, জেলা পরিষদের এক্সিকিউটিভ অফিসারের কাছে স্মারকলিপি দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়।

অন্ধ্রপ্রদেশের অনন্তপুরে প্রার্থী কমরেড বিনাগামুত্তালুর প্রচার

সংস্কারবাদী আর বিপ্লবী বামপন্থার তফাতটা স্পষ্ট হচ্ছে

‘আচ্ছা, আমাদের কেন্দ্রীয় নেতাদের কাউকে একদিন কেরালায় আর তার পরের দিন পশ্চিমবঙ্গে সভায় বক্তৃতা দিতে হলে তাঁরা কী বলবেন বলুন তো?’ হিন্দ সিনেমার মোড়ে চায়ের দোকানের আড্ডায় প্রশ্নটা ছুঁড়ে দিলেন যিনি, তিনি এলাকায় সিপিএমের পরিচিত মুখ। কথাটা লুফে নিলেন যিনি, তিনিও সিটুর সঙ্গে যুক্ত। বললেন— কেরালায় নেতাদের গলা ফাটিয়ে বলতে হবে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে, আর পরের দিন উড়ে এসে বাংলায় সেই কংগ্রেসকে দেখাতে হবে প্রগতিশীল, ধর্মনিরপেক্ষ শক্তি হিসাবে!

একই কংগ্রেসের দুই চরিত্র? খোঁচা দিলেন একেবারেই রাজনীতির বৃত্তের বাইরের এক প্রবীণ, কংগ্রেস যদি বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনের শক্তি হয়, সারা ভারতেই তা হওয়ার কথা। তা হলে কেরালায় সমীকরণটা বদলে যাচ্ছে কেন? খোদ রাহুল গান্ধী কেরালায় তোমাদের শরিক সিপিআইয়ের বিরুদ্ধে প্রার্থী। কেরালায় সিপিএম সরকারের মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস বলেই কি সে রাজ্যে তারা বিজেপির বিরুদ্ধে আন্দোলনের শক্তি থাকল না! খালি হয়ে যাওয়া চায়ের ভাঁড়টাকে জোরে ছুঁড়ে ফেলে বলে উঠলেন প্রথম জন, নেতারা প্রচার করতে বলছেন, কিন্তু এ সব কথা বলব কী করে? যা খুশি বোঝাতে চাইলেই কি মানুষ মেনে নেবে?

আর চুপ থাকতে না পেরে বলে উঠলাম, মানুষ মানবে কি না পরের কথা, আপনারা মানছেন কি? উত্তরটা দিতে গিয়ে একটু থমকালেন তিনি— ৩০ বছর এই দলটা করছি, দলের নেতাদের কথাকে বেদবাক্য বলে মেনেছি চিরকাল। কিন্তু এবার একটু অসুবিধা হচ্ছে। এই সুবোধ মল্লিক স্কোয়ারের খাদ্য আন্দোলনের শহিদ বেদিতে মালা দিতে গিয়ে কংগ্রেসী অত্যাচারের কাহিনী কত বলেছি। এই এলাকার গলিতে গলিতে কংগ্রেসী গুণ্ডাদের বোমাবাজির কথা এলাকার মানুষ কি ভুলে গেছে! কলেজে কলেজে ছাত্র পরিষদের গুণ্ডামির শিকার হতে দেখেছি দলের কর্মীদের। মধ্য কলকাতার পুরনো কংগ্রেসী নেতাদের মুখেই ছোটবেলায় শুনতাম দেশভাগের সময়ে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা পরিচালনায় তাঁদের ভূমিকার কথা, বড় গর্বের বিষয় ছিল এটা তাঁদের কাছে। আবার এঁরাই উদ্বাস্তুদের বিরুদ্ধে নানা টিকা-টিপ্পনি ছুঁড়ে বামপন্থীদের ব্যঙ্গ করতেন। আজও মধ্য কলকাতার পুরনো এক কংগ্রেসী নেতার ছবি সামনে রেখে ‘হিন্দু সংহতির’র নামে মাথায় ফেট্টি বাঁধা উগ্র সাম্প্রদায়িক স্লোগান দেওয়া মিছিল হয়। জরুরি অবস্থার নায়ক কংগ্রেস নেত্রী ইন্দিরা গান্ধী। দেওয়ালে আমরাই ওদের হাত চিহ্নকে ব্যঙ্গ করে বড় বড় নখওয়ালা রক্তাক্ত হাত এঁকেছি। কংগ্রেস বললেই মধ্য কলকাতার মানুষের এই সব কথা মনে পড়বেই। তাই বড় কষ্ট হচ্ছে, মন মানতে চাইছে না নেতাদের কথা মতো কংগ্রেসকে সেকুলার, গণতান্ত্রিক শক্তি হিসাবে তুলে ধরতে। ভোটের দিনে কংগ্রেসের বোতাম টিপতে হবে ভাবলেও শিউরে উঠছি।

আবার যাদবপুরের ৮বি মোড়ের গলিতে চায়ের দোকানের বামপন্থী আড্ডায় উপস্থিত এক সিপিএম কর্মীর খটকা লাগছে— রাজ্যে সাধারণ মানুষ তৃণমূলের চুরি-দুর্নীতির বিরুদ্ধে ফেটে পড়ছে, অথচ জনগণের মধ্যে সিপিএমকেই চাই দাবি উঠছে না কেন? প্রশ্নের ঝড় বইয়ে দিলেন— কেন পশ্চিমবঙ্গেও সংকীর্ণ চাওয়া-পাওয়ার হিসাবটাই ভোট আলোচনার প্রধান বিষয় হতে পারছে? কেন বিজেপি এ রাজ্যে প্রধান বিরোধী হিসাবে উঠে আসতে পারছে? তিনি নেতাদের প্রশ্ন করে উত্তর পেয়েছেন, তৃণমূলের রাজনীতিই এর জন্য দায়ী। কিন্তু শুধুই তাই! এ নিয়ে ধন্দ আছে তাঁর। তাঁর প্রশ্ন, ধর্মভিত্তিক দল আইএসএফকে নিয়ে কোন আশায় সিপিএম নেতারা এতদিন ধরে বসে রইলেন? তাঁকে জিজ্ঞাসা করলাম, ৩৪ বছর একটানা সরকার চালানো একটা বামপন্থী দলের কর্মী-সমর্থক-শুভানুধ্যায়ীদের পরিবারগুলিতে বামপন্থী রাজনীতি, বামপন্থী সংস্কৃতি, বামপন্থী মূল্যবোধের চর্চা গড়ে উঠল না কেন? এই বিশাল শক্তিটাই তো বিজেপির সাম্প্রদায়িক রাজনীতি, তৃণমূলের দুর্নীতির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে পারে। কোথায় তারা? তিনি বলে উঠলেন, দূর মশাই, আপনারাও যেমন, এ জন্যই আপনারা গদিতে যেতে পারলেন না! ভোটে জেতাটাই আসল কথা, না হলে কি এই সব আদর্শ ধুয়ে জল খাব! বিপ্লব, সমাজপরিবর্তন, ওসব বইয়ের কথা। নেতাদের পাবলিক মিটিংয়ে নীতিটিতি নিয়ে কিছু বলতে হয় বলেন। এগুলো নিয়ে আমরা মাথা ঘামাই না। ভোটের হিসাব বলে, যা দিলে লোকে দলে থাকবে তা দিতে হবে। ক্ষমতায় থাকার সময় আমাদের নিখুঁত হিসাব থাকত, কী কী সুবিধা দিলে কোন পাড়ার ভোট হবে। দরকারে ধর্ম-জাতপাতের হিসাবও কষতে হবে। তিনি বলে চললেন, আরে মশাই দুর্নীতিটা করতে গেলেও মাথা লাগে। পিছনের দরজা দিয়ে টাকার সোর্স না থাকলে আমাদের পার্টির পঞ্চায়েত থেকে কাউন্সিলরদের এত চাকচিক্য কয় বছরে এমনি বেড়েছিল? তবে এখনকার মতো প্রকাশ্যে ল্যাজেগোবরে অবস্থা হত না। নেতারা ঠিক সামলে দিতেন। পার্টি বাড়াতে গেলে দলবাজি লাগবেই, নীতিকথা দিয়ে হবে না মশাই। থানাকে পার্টি অফিস বানানো? সে তো কংগ্রেস আমল থেকেই শুরু, আমরা তা পাল্টাতে যাব কেন? দল রাখতে গেলে এ সব করতেই হয়। বললাম, তা হলে বুর্জোয়া রাজনীতির বিকল্প রাজনীতি তুলে ধরা, যেটা বামপন্থীদের আসল কাজ, তার কী হবে! ভদ্রলোক একটু দ্বিধান্বিত, দলে ওসব কথা কেউ কোনও দিন বলেনি। কে জানে হয়ত আপনিই ঠিক, বামপন্থা ছেড়ে সরকারি ক্ষমতাকেই প্রধান করলে এমনই বোধহয় হয়! মাথাটা গুলিয়ে যাচ্ছে, পরে ভাবব।

উত্তর কলকাতার মৌলালির কাছে গলিতে একটি পুরনো বামপন্থী ইউনিয়নের অফিস সামলানো এক প্রবীণ কর্মীর কাছে শোনা গেল, এখনও সিপিএমের নিচুতলায় চাপা স্রোত আছে এ রাজ্যে ‘আগে রাম পরে বাম’-এর পক্ষে। বললাম, এটা কি বামপন্থী হিসাবে আত্মঘাতী কাজ নয়? সুবিধা বিতরণ, দুর্নীতিতে প্রশ্রয় দেওয়া, স্বজন পোষণ, দলবাজি এগুলোই যদি দল বাড়ানোর রাস্তা হয়, তা হলে যে বেশি দেবে ভোট বাক্স সেদিকেই ভারী হবে না কি? এ ছাড়া, গায়ের জোরে পাড়ার দখল রাখা, যুক্তি শুনব না, আমরা ২৩৫ ওরা ৩০ ওদের কথা শুনতে হবে!— এই মানসিকতা কি অন্ধতা বাড়ায় না? তাতে কি বিজেপির মতো সাম্প্রদায়িক শক্তির জমি তৈরি হয় না? বিজেপিকে জায়গা করে দেওয়ার ক্ষেত্রে সিপিএমের ভূমিকা কি নেই? ১৯৭৭-এ জনসংঘ-আরএসএসকে নিয়ে গঠিত জনতা পার্টির সরকারকে সমর্থন, ১৯৮৮-তে কলকাতার শহিদ মিনার ময়দানে অটলবিহারী বাজপেয়ীর সঙ্গে সিপিএম নেতা জ্যোতি বসুর যৌথ সভা, ১৯৮৯-তে বিজেপির সাথে মিলে ভিপি সিং সরকারকে সমর্থন, ১৯৯০-এ আদবানিজির রামরথকে পশ্চিমবঙ্গে অবাধে ঢুকতে দেওয়া, ঝলাদায় সে রথের কারণে দাঙ্গা এরই তো উদাহরণ! উনিও মানলেন, ১৯৯২-এ বাবরি মসজিদ ভাঙার পর কলকাতার ট্যাংরা সহ কিছু জায়গায় দাঙ্গা হতেই পারত না পিছনে সিপিএমের প্রচ্ছন্ন মদত না থাকলে। ২০০২-তে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য সমস্ত মাদ্রাসাকে সন্ত্রাসবাদের আখড়া বলে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী বিজেপি নেতা এলকে আদবানির প্রশংসা কুড়িয়েছিলেন। এই আদবানিজি ২০০৫ এবং ২০০৮-এ সিপিএম নেতা বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের বিশ্বায়নের অনুসারী আর্থিক সংস্কারের দৃষ্টিভঙ্গিকে খুব প্রশংসা করেছিলেন। বিজেপির মতো একচেটিয়া পুঁজিপতিদের অতি বিশ্বস্ত একটা দলের নেতা সিপিএমের সরকারের আর্থিক নীতির প্রশংসা করছে! অবাক লাগে না? বললাম, যে কোনও ভাবে হোক না কেন, সরকারে টিকে থাকার জন্য পুঁজিপতিদের তোয়াজ করে চাষিকে উচ্ছেদ করা, বিরোধী পক্ষে থাকলে গদি ফিরে পাওয়ার লোভে যার সাথে পারি তার হাত ধরে ঝুলে পড়া— এগুলো কি বামপন্থার শক্তি বাড়ায়? এই ধরনের নানা কৌশলে কোনও বামপন্থী দল যদি কিছু আসন পেয়েও যায় তাতে বামপন্থা শক্তিশালী হয় কি? চুপ করে রইলেন বামপন্থার প্রতি বিশ্বাস নিয়ে এতদিন চলা মানুষটি। দীর্ঘশ্বাসের শব্দটা চাপতে পারলেন না, চশমাটা খুলে চোখ মোছার ভঙ্গিতেই ধরা পড়ল দলের ভূমিকায় ক্ষতবিক্ষত হওয়া মনের ছবিটা।

নিউটাউনের এক পুরনো সিপিএম কর্মী বাড়িতে ডেকে বসালেন। একসময় এই রাজারহাট-নিউটাউন এলাকায় সিপিএমের দাপটে বিরোধীদের মাথা তোলা দূরে থাক, প্রকাশ্যে কোনও কথা বলাই ছিল ঝুঁকির কাজ। এই এলাকার প্রতি পাড়ায় ছিল সিপিএমের লোক। বলছিলেন, সরকারি গদি থেকে আমরা চলে যাওয়ার পরেই সংগঠনের দশা বেহাল। এখন কংগ্রেসের সাহায্য ছাড়া আমাদের পার্টি নেতারা উঠে দাঁড়ানোর কথা ভাবতেই পারছে না! তৃণমূলের এত দুর্নীতি, তা নিয়ে সমাজমাধ্যমে অনেক প্রচার হচ্ছে। বিজেপির বিরুদ্ধে নেতারা অনেক কথা বলেন, কিন্তু রাস্তায় নেমে আন্দোলন কোথায়? বললাম, ভেবে দেখবেন, এটা কি সরকারি ক্ষমতা-সর্বস্বতার রাস্তায় গিয়ে বামপন্থা বিসর্জন দেওয়ার ফল নয়? ভদ্রলোক বলে গেলেন— এ ভাবে ভাবিনি কোনও দিন, দল ক্ষমতায় থেকেছে অনেকদিন তাতেই আমরা অভ্যস্ত হয়ে গেছিলাম। ১৯৬০-৭০-এর দশকের মতো লড়াইয়ের কথা এখন আমরা ভাবতে পারছি না বোধহয়!

কোচবিহারের এক সিপিএম কর্মী ব্যথিত, ওই জেলার কংগ্রেস নেতারা বর্ষীয়ান সিপিএম নেতা বিমান বসু সম্বন্ধে যে কটূক্তি করেছেন তা শুনে। প্রশ্ন করলাম, কংগ্রেস আবার কেন্দ্রের গদিতে বসলে বিজেপির থেকে মূলগত কী পার্থক্য ঘটাবে? সাম্প্রদায়িকতা, রামমন্দির রাজনীতি, গণতন্ত্র-হরণের আইন ইত্যাদি প্রশ্নে কংগ্রেস ও বিজেপির বিশেষ কিছু পার্থক্য আছে কি? কংগ্রেসই ভারতে উদার-অর্থনীতি, বিশ্বায়নের ফরমুলার প্রণেতা। এনআরসি, সিএএ-র মাধ্যমে বিভাজনের রাজনীতির শুরুও কংগ্রেসের হাতে। জাতীয় পুঁজিপতি শ্রেণি এ দেশে ফ্যাসিবাদের ভিত প্রতিষ্ঠার কাজটা কংগ্রেসের সাহায্যেই শুরু করেছে। বিজেপি তাকে আরও জোরদার করছে, মজবুত করছে। একই শ্রেণির দুটি দলের একটিকে প্রগতিশীল বলে চিহ্নিত করার চেষ্টা কি বামপন্থার কর্মসূচি? একই লোক কয়েক ঘণ্টার ব্যবধানে কখনও কংগ্রেস কখনও বিজেপিতে গিয়ে স্বচ্ছন্দে নেতা বনে যাচ্ছে। এই দুই দলের রাজনীতির মূলগত পার্থক্য কিছু আছে? কংগ্রেস হাইকম্যান্ড তো শেষ পর্যন্ত তৃণমূলের সাথে ঐক্যের চেষ্টা চালিয়ে গেছেন। ভোটের পর পরিস্থিতি বদলালে তারা পরস্পরের হাত ধরবে না, এমন গ্যারান্টি আছে? এই কংগ্রেস তৃণমূলের বিরুদ্ধে কেমন জোট শরিক হবে? কংগ্রেস এবং তৃণমূল উভয় দলই তথাকথিত নরম হিন্দুত্ব এবং সাম্প্রদায়িক ভোটব্যাঙ্কের রাজনীতি খোলাখুলিভাবে করছে। তা ছাড়া কংগ্রেস দুর্নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলনের নির্ভরযোগ্য শক্তি হল কবে?

তা হলে বিজেপির সর্বনাশা রাজনীতির বিরুদ্ধে, তৃণমূলের দুর্নীতি অপশাসনের বিরুদ্ধে বিকল্প রাজনীতির পতাকা নিয়ে দাঁড়াতে পারে কোন শক্তি? সংগ্রামী বামপন্থার শক্তি ছাড়া, তার নেতৃত্বে শক্তিশালী বামপন্থী আন্দোলন ছাড়া এর কোনও বিকল্প আছে কি? দিল্লির কৃষক আন্দোলন থেকে শুরু করে সারা দেশে নানা আন্দোলন এ কথাই বারবার প্রমাণ করেছে যে, দেশের মানুষ আন্দোলন চাইছেন। এই আন্দোলনের প্রস্তাবই বারবার সিপিএম সহ বামপন্থী দলগুলির নেতাদের কাছে রেখেছে এস ইউ সি আই (সি)। অথচ বামপন্থার নামে সংস্কারবাদের পথ ধরে কংগ্রেস, আইএসএফকেই বেশি নির্ভরযোগ্য মনে করল সিপিএম!

সিপিএম দলের কর্মী, সমর্থক যাঁরা আজও বামপন্থার প্রতি আকর্ষণ থেকে রাজনীতি করেন, সিপিএম নেতৃত্বের কংগ্রেসের মুখাপেক্ষী ভূমিকায় যারা ব্যথিত, তাঁদের কাছে অনুরোধ, ভেবে দেখুন— এই আপসের পথে, সংস্কারবাদের পথে নানা কৌশলে কিছু এমএলএ-এমপি পেলেই কি বামপন্থা শক্তিশালী হবে? বামপন্থী আদর্শ ছাড়া বামপন্থা শক্তিশালী হয় কি? যদি তা হত, তা হলে ভোটে হেরে সব সম্বল-শক্তি হারিয়ে ফেলার মতো দশা সিপিএমের হত কি? এটা বামপন্থার নামে সংস্কারবাদ ও ভোটসর্বস্বতারই রোগ লক্ষণ নয় কি? আসলে বামপন্থা পরিত্যাগের লক্ষণ এটা। বামপন্থার সংগ্রামী পথে অবিচল থেকে একটা আসনও না জিতলেও বামপন্থী আদর্শটার মর্যাদাহানি ঘটে না। এই পথে থাকলে তার মধ্য দিয়ে শক্তি সঞ্চয় করে বামপন্থার ভিত্তিতেই নির্বাচনেও নিজের কোমরের জোরে দাঁড়ানো সম্ভব হয়। তাতে গণআন্দোলন শক্তিশালী হয়, আগামী দিনের সমাজবদলের রাস্তা প্রশস্ত হয়। এস ইউ সি আই (সি) সেই চ্যালেঞ্জটাই নিয়েছে। এখানেই স্পষ্ট হয়ে যাচ্ছে এস ইউ সি আই (সি)-র বিপ্লবী বামপন্থা আর সিপিএমের সংস্কারবাদী বামপন্থার পার্থক্য।

কে বড় দুর্নীতিবাজ

একের পাতার পর

করেননি— এমন কথা কেউই বলতে পারছেন না। দুর্নীতিবাজ হিসাবে কে বড়, যেন তারই প্রতিযোগিতা চলছে।

নির্বাচনী বন্ডের নামে বিজেপির দলীয় তহবিলে পুঁজিপতিদের থেকে হাজার হাজার কোটি টাকা এসেছে। এই কেলেঙ্কারিকে বিশ্বের বৃহত্তম আর্থিক কেলেঙ্কারি বলে উল্লেখ করেছেন মোদি সরকারের অর্থমন্ত্রীর স্বামী বিশিষ্ট অর্থনীতিবিদ পরাকলা প্রভাকরও। আগে কোম্পানি আইনে উল্লেখ ছিল, কোম্পানি তার তিন বছরের মুনাফার সর্বোচ্চ ৭.৫ শতাংশ চাঁদা হিসাবে তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলকে দিতে পারবে। মোদি সংশোধনী এনে বললেন, মুনাফা না হলেও তারা তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলকে চাঁদা দিতে পারবে। এমনকি দেউলিয়া ঘোষিত কোম্পানিও যাতে চাঁদা দিতে পারে তার ব্যবস্থাও রাখা হয়। যতটুকু তথ্য সুপ্রিম কোর্টের চাপে প্রকাশিত হয়েছে তাতে দেখা যাচ্ছে, এক পয়সা মুনাফা না করেও কোটি কোটি টাকা পুঁজিপতিদের বিভিন্ন কোম্পানি তাদের পছন্দের রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে। দি হিন্দু পত্রিকা বন্ড তথ্য বিশ্লেষণ করে দেখিয়েছে ৩৩টি কোম্পানির মোট ক্ষতি ১ লক্ষ কোটি টাকা সত্ত্বেও ৫৭৬.২ কোটি টাকার বন্ড কিনেছে, যার ৭৪ শতাংশ টাকা পেয়েছে বিজেপি। লোকসান করেও এত টাকা তারা কী করে দিল? আসলে এই কোম্পানিগুলো বিভিন্ন একচেটিয়া পুঁজিপতির তৈরি ভুয়ো এবং স্রেফ কাগুজে কোম্পানি। এই ভুয়ো কোম্পানির আড়ালে আসলে একচেটিয়া মালিকরাই বিজেপিকে টাকা দিয়েছে, যাতে বিজেপি ক্ষমতাসীন হয়ে তাদের এর বহুগুণ টাকা তোলার ব্যবস্থা করে দিতে পারে।

৫ এপ্রিল হিন্দু পত্রিকা দেখিয়েছে, ৬টি কোম্পানি সাত বছরে যত লাভ করেছে, তার থেকে বেশি টাকা অর্থাৎ ৬৪৬ কোটি টাকা বন্ডের মাধ্যমে রাজনৈতিক দলকে দিয়েছে, যার ৯৩ শতাংশ টাকা পেয়েছে বিজেপি।

যতটুকু খবরে প্রকাশ তাতে দেখা যাচ্ছে, বন্ড কেনার আগে বিভিন্ন কোম্পানিতে প্রথমে ইডি-কে পাঠানো হয়েছে। আর তার পরে পরেই কোটি কোটি টাকা বিজেপিকে দিয়েছে ওই সব কোম্পানি। অর্থাৎ ইডি হানার ভয় দেখিয়ে কোটি কোটি টাকা তোলা হয়েছে। এটা তো সংগঠিত সরকারি তোলাবাজির ঘৃণ্য নমুনা।

মোদি নাকি দুর্নীতিবাজদের সাজা দেবেন! কেন মোদি জোর গলায় এ সব কথা বলছেন? আসলে দলের দুর্নীতি ঢাকতেই তাঁকে এসব প্রচার করতে হচ্ছে। এদিকে দেখা যাচ্ছে, অন্য দলের অভিযুক্ত ব্যক্তি বিজেপিতে ঢুকলেই ধোওয়া তুলসীপাতা হয়ে যাচ্ছে। সারা দেশে ২৫ জন বিরোধী নেতা, যাদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ নিয়ে এক সময় বিজেপি সোচ্চার ছিল, তাঁরা বিজেপিতে ঢুকতেই ইডি বোবা হয়ে গেছে। বিজেপিতে তাঁরা এখন নেতার পদ পেয়ে গেছেন। এগুলি কি দুর্নীতি দমনের লক্ষণ?

পুঁজিপতিরা তাদের শ্রেণিস্বার্থে কাজ করাতে সেবাদাস দলগুলিকে টাকা দেয়— এটা কোনও নতুন কথা নয়। এতদিন এ নিয়ে যেটুকু আড়াল ছিল নির্বাচনী বন্ড কেলেঙ্কারিতে তা একেবারে বে-আব্রু হয়ে গেছে। এখন দেশের মানুষের কাছে এটা স্পষ্ট যে, বিজেপি ভারতীয় পুঁজিপতিদের অত্যন্ত বিশ্বস্ত নির্ভরযোগ্য দল। বিজেপি নামটার সাথে 'ভারতীয় জনতা' শব্দটা যতই জুড়ে থাক না কেন, তা শুধু জনতাকে ঠকানোর জন্যই জোড়া। বিজেপি পুরোপুরি পুঁজিপতি শ্রেণির দল। পুঁজিপতি শ্রেণিরই সেবাদাস এবং রাজনৈতিক ম্যানেজার ছাড়া বিজেপি আর কিছু নয়। অন্যান্য সংসদীয় দলগুলির ক্ষেত্রেও কথাটা সত্য। তাই তারাও বন্ডের মাধ্যমে অথবা অন্য কোনও ভাবে কর্পোরেট পুঁজি মালিকদের থেকে টাকা পেয়েছে।

তা হলে জনসাধারণের স্বার্থ নিয়ে কোনও দল যথার্থ অর্থে লড়াই করলে, সেই দলের টাকার উৎস কী হবে? তেমন একটি পার্টি যেহেতু শ্রমিক শ্রেণির পার্টি, শোষিত মানুষের স্বার্থরক্ষাকারী পার্টি, ফলে শ্রমিক, কৃষক মেহনতি মানুষই তার শক্তির উৎস, অর্থের উৎস। এই কারণে দেখা যায় বিপ্লবী বামপন্থী লাইন নিয়ে চলা এস ইউ সি আই (কমিউনিস্ট) নির্বাচনী সংগ্রাম থেকে শুরু করে সমস্ত কর্মকাণ্ডের জন্যই জনগণের থেকেই তিল তিল করে অর্থসংগ্রহ করে এবং তা দিয়েই সমস্ত রকমের খরচ চালায়। কোনও পুঁজিপতির দয়ার দানের উপর এই দল নির্ভর করে না। তাই শ্রমিক-কৃষক-মেহনতি মানুষের হয়ে কোনও বৃহৎ পুঁজিপতি গোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়াতে তাদের এতটুকু অসুবিধা হয় না। মেকি বামপন্থীদের মতো বিশেষ কোনও পুঁজিপতিকে প্রগতিশীল বলে তুলে ধরে তার তাঁবেদারি করা এবং শোষিত মানুষের সাথে প্রতারণা করার দরকারও এই দলের হয় না।

মালদায় মনোনয়নে বিজেপির হামলা

১২ এপ্রিল শতাধিক কর্মী-সমর্থকের সুসজ্জিত মিছিল সহযোগে মালদা ডিএম অফিসে নমিনেশন জমা দিল এসইউসিআই(কমিউনিস্ট)। মালদহ উত্তর লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড কালীচরণ রায় ও মালদহ দক্ষিণ লোকসভা কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড অংশুধর মণ্ডলকে নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র মিছিল ডিএম অফিসে পৌঁছলে হঠাৎ করেই পিছনে আসা বিজেপির বর্তমান এমপি খগেন মুর্মুর সাঙ্গোপাঙ্গরা মিছিলে উপস্থিত মহিলা কমরেডদের সঙ্গে অভব্য আচরণ করে, গায়ে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে সামনে চলে আসে। পুলিশ প্রশাসনের নির্বিকার ভূমিকায় দলের কর্মীরা তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করলে পুলিশ ভুল স্বীকার করে। এরপর দলের প্রার্থীরা মনোনয়নপত্র দাখিল করতে যান। এসইউসিআই(সি) মালদা জেলা কমিটির পক্ষ থেকে বিজেপির এই ন্যক্কারজনক আচরণের তীব্র নিন্দা করা হয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য খগেন মুর্মু আগে সিপিএমের নেতা ছিলেন।

মালদা জেলা সম্পাদক কমরেড গৌতম সরকার জেলার দুটি কেন্দ্রে একমাত্র বামপন্থী এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থীদের ভোটে জয়ী করার আহ্বান জানান।

ভারত শুধু হিন্দুদের! মানেন না অধিকাংশ ভারতবাসী

ভারতে ধর্মীয় সহনশীলতা কেমন, তা নিয়ে সম্প্রতি একটি সমীক্ষা চালিয়েছে সিএসডিএস-লোকনীতি। 'ভারত শুধু হিন্দুদের নয়, সমস্ত ধর্মের মানুষেরই দেশ' এবং 'ভারত শুধু হিন্দুদেরই'— এই দুটি বক্তব্য সম্পর্কে বিভিন্ন ধর্ম, বয়স, শিক্ষাগত যোগ্যতা ও বাসস্থানের দিক দিয়ে বিভিন্ন স্তরের মানুষকে সমীক্ষকরা মতামত দিতে অনুরোধ করেছিলেন। আরএসএস-বিজেপি যতই ভারতকে 'হিন্দুরাষ্ট্র' বানানোর হুঙ্কার দিক, দেখা যাচ্ছে অধিকাংশ মানুষই সমীক্ষকদের জানিয়েছেন, ভারত সমস্ত ধর্মের মানুষেরই দেশ। সমীক্ষায় দেখা যাচ্ছে, শুধু মুসলমান কিংবা অন্য সংখ্যালঘু ধর্মের মানুষই নয়, এমনকি হিন্দু ধর্মাবলম্বী মানুষের বেশিরভাগ অংশই মনে করেন ভারত সমস্ত ধর্মের মানুষের দেশ।

আরও দেখা যাচ্ছে, প্রবীণ ও শিক্ষায় পিছিয়ে থাকা মানুষের তুলনায় তরুণ ও শিক্ষিত মানুষদের আরও বড় অংশ ভারতকে শুধু হিন্দুদের দেশ মনে করেন না। আবার গ্রামের তুলনায় শহরের বড় অংশের মানুষ সব ধর্মের সহাবস্থানে বিশ্বাসী। সমীক্ষার ফলাফল নিচের তালিকাগুলিতে প্রকাশ করা হল।

(সূত্র ঃ দ্য হিন্দু, ১২ এপ্রিল, ২০২৪)

ভারতে ধর্মীয় সহনশীলতা

ভারত শুধু হিন্দুদের নয়, সমস্ত ধর্মের মানুষের দেশ	৭৯ শতাংশ
ভারত শুধু হিন্দুদের দেশ	১১ শতাংশ
কোনও মতামত নেই	১০ শতাংশ

যাঁরা মনে করেন, ভারত শুধু হিন্দুদের নয়, সমস্ত ধর্মের মানুষের দেশ	
শিক্ষাগত যোগ্যতা	
স্কুলশিক্ষা বঞ্চিত	৭২ শতাংশ
স্নাতক ও তার ঊর্ধ্ব	৮৩ শতাংশ
বাসস্থান	
গ্রাম	৭৬ শতাংশ
শহর	৮৫ শতাংশ
বড় শহর	৮৪ শতাংশ

যাঁরা মনে করেন, ভারত শুধু হিন্দুদের নয়, সমস্ত ধর্মের মানুষের দেশ	
ধর্ম	
হিন্দু	৭৭ শতাংশ
মুসলমান	৮৭ শতাংশ
অন্যান্য সংখ্যালঘিষ্ঠ	৮১ শতাংশ
বয়স	
১৮-২৫ বছর	৮১ শতাংশ
৫৬ বছর ও তার ঊর্ধ্বে	৭৩

কমরেড ভেনুগোপাল শুধু পার্টির নেতা নন, জননেতাও ছিলেন

দলের পলিটবুরো সদস্য ও কেরালা রাজ্য কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপাল স্মরণে সভা অনুষ্ঠিত হয় ১২ এপ্রিল কলকাতার মৌলালি যুবকেন্দ্র অডিটোরিয়ামে। সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ পলিটবুরো সদস্য কমরেড অসিত ভট্টাচার্য। প্রধান বক্তা ছিলেন দলের সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষ। এ ছাড়াও বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য, কেরালা রাজ্য সম্পাদক কমরেড জয়সন জোসেফ। কমরেড ভেনুগোপালের সংগ্রামী জীবন সম্পর্কে কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য পাঠ করেন পলিটবুরো সদস্য কমরেড অমিতাভ চ্যাটার্জী। অনুষ্ঠানটি সারা দেশে অনলাইনে সম্প্রচারিত হয়। শ্রদ্ধার্ঘ্যটি প্রকাশ করা হল।

কেন্দ্রীয় কমিটির শ্রদ্ধার্ঘ্য

কলকাতায় মৌলালি যুবকেন্দ্রে প্রয়াত কমরেড ভি ভেনুগোপালের প্রতি কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্যদের শ্রদ্ধাজ্ঞাপন

এস ইউ সি আই (সি)-র পলিটবুরো সদস্য এবং কেরালা রাজ্য কমিটির পূর্বতন সম্পাদক কমরেড ভি ভেনুগোপাল ৩০ মার্চ রাত্রি সাড়ে ন'টায় শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেছেন। বয়স হয়েছিল ৬৮ বছর। বিগত ৯ বছর ধরে তিনি পার্কিনসনস রোগে ভুগছিলেন। শেষ দুই বছর নয় মাস তিনি আম্বালাপুঝার সূর্য হাসপাতালে সম্পূর্ণ শয্যাশায়ী অবস্থায় ছিলেন। সেই সময় চিকিৎসক-পার্টিকর্মীদের একটি টিম সর্বক্ষণ তাঁর দেখাশোনা করেছেন। রোগের বিরুদ্ধে দীর্ঘ লড়াইয়ের পর তাঁকে আমরা হারালাম।

১৯৭৫ সালে তিরুবনন্তপুরমের গভর্নমেন্ট মেডিকেল কলেজে পড়ার সময় কমরেড ভি ভেনুগোপাল এ যুগের অগ্রগণ্য মার্ক্সবাদী চিন্তানায়ক এবং এস ইউ সি আই (সি)-র প্রতিষ্ঠাতা কমরেড শিবদাস ঘোষের চিন্তাধারার সংস্পর্শে আসেন। খুব অল্প দিনের মধ্যেই তিনি দলের সর্বক্ষণের কর্মী হয়ে ওঠেন। তখন থেকে একেবারে শেষনিঃশ্বাস ত্যাগের মুহূর্তটি পর্যন্ত বিপ্লবী আন্দোলনকে শক্তিশালী করার জন্য দায়িত্ব পালনে অটল থেকেছেন। দল গড়ে তোলার দিনগুলিতে যাঁরা এর সাথে যুক্ত হয়েছেন তাঁদের যে ধরনের তীব্র সংকট, অর্থাভাব এবং সর্বদিক থেকে প্রবল প্রতিকূলতার মধ্য দিয়ে যেতে হয়েছে তা যে কোনও মানুষকেই লক্ষ্যচ্যুত করতে পারে। কিন্তু তাঁর চরিত্রের গঠন ছিল বিরল ধাঁচের।

কমরেড ভেনুগোপালের জন্ম মধ্যবিত্ত পরিবারে। তাঁর বাবা, মা দুজনেই ছিলেন স্কুল-শিক্ষক। সচ্ছল পরিবার থেকে এলেও পার্টি জীবনের প্রতিকূলতা, এমনকি অনাহারও তাঁকে হতোদ্যম করতে পারেনি।

কেরালায় সংগঠন গড়ে ওঠার প্রথম দিকে দলের কেন্দ্রীয় কমিটির পূর্বতন সদস্য কমরেড কৃষ্ণ চক্রবর্তীকে পাঠানো হয় সংগঠন বিস্তারে সাহায্য করার জন্য। তিনি এই ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। সেদিন কেরালার মাটিতে যাঁরা পার্টি গঠনের কাজে এগিয়ে এসেছিলেন, তাঁদের মধ্যে কিছুজন কষ্টসাধ্য বিপ্লবী জীবনসংগ্রাম পরিচালিত করতে না পেরে পিছিয়ে গেছেন। কিন্তু প্রয়াত কমরেড সি কে লুকোস, কমরেড এ জালালুদ্দিন, কমরেড জি এস পদ্মকুমার সহ অন্যান্যদের সাথে মিলে কমরেড ভেনুগোপাল দলের পতাকাকে দৃঢ়মুষ্টিতে উর্ধ্বে তুলে রেখেছেন। জরুরি অবস্থার সময় পুলিশ তাঁকে দু'বার গ্রেফতার করে হেফাজতে রাখে। ছাত্র-নেতা হিসাবে তিনি বারবার সিপিএম-আশ্রিত গুণ্ডাদের হতে আক্রান্ত হলেও কেরালায় এআইডিএসও-কে দৃঢ়তার সঙ্গে নেতৃত্ব দিয়েছেন। এআইডিএসও-র কেরালা রাজ্য সম্পাদক এবং রাজ্য সভাপতি হিসাবে তিনি দীর্ঘদিন নেতৃত্বকারী ভূমিকা পালন করেছেন।

১৯৮৩-তে তিনি মেডিকেল ডিগ্রি লাভ করেন। কিন্তু সচ্ছল জীবনের হাতছানিকে তিনি আনন্দ ও পরিপূর্ণ তৃপ্তির সঙ্গে উপেক্ষা করেছিলেন। এ জন্য কোনও ত্যাগ-মাহাত্ম্যের ভাব তাঁর ছিল না। বিপ্লবী জীবনই হল সর্বাপেক্ষা মর্যাদাময় জীবন, কমরেড শিবদাস ঘোষের এই শিক্ষাকে তিনি দৃঢ়তার সঙ্গে তাঁর অতি প্রিয় বাবা-মা, শিক্ষক এবং সহপাঠীদের কাছে তুলে ধরেছেন। যে কারণে কমরেড ভেনুগোপালের অসুস্থতার খবর পেয়েই তাঁর সহপাঠী ও শিক্ষকরা কারও কোনও অনুরোধ ছাড়াই নিজেদের উদ্যোগে বিরাট পরিমাণ আর্থিক সাহায্য সংগ্রহ করে অশ্রুসজল চোখে দলের হাতে তুলে দেন। অন্যদের ওপর কমরেড ভেনুগোপালের বিপ্লবী জীবনের গভীর প্রভাবের সাক্ষ্য বহনকারী এমন অনেক ঘটনা আছে।

মৌলালি যুবকেন্দ্র অডিটোরিয়ামে উপস্থিত দলের নেতা-কর্মী-দরদিরা

তাঁর জীবন ছিল পার্টি ও বিপ্লবের স্বার্থে পুরোপুরি নিবেদিত। ব্যক্তিগত স্বার্থকে শ্রেণি, দল ও বিপ্লবের স্বার্থের সাথে বিলীন করে দেওয়ার মতো উন্নত চরিত্রের স্তর অর্জন করতে গেলে কমরেড শিবদাস ঘোষের শিক্ষার ভিত্তিতে যে কঠোর সংগ্রাম প্রয়োজন কমরেড ভেনুগোপাল সেই সংগ্রামে নিয়োজিত ছিলেন। তিনি সেই স্তর অর্জন করতে পেরেছিলেন এবং দল তাঁকে 'স্টাফ সদস্যপদ' প্রদান করে। 'আমি' শব্দটা তাঁর মনোজগতে অনুপস্থিত ছিল, তাই কেউ তাঁকে এই শব্দটা ব্যবহার করতে কখনও শোনেনি। নিজেকে ব্যক্তিবাদ থেকে মুক্ত রাখার যে সচেতন সংগ্রামে তিনি লিপ্ত ছিলেন এ ছিল তারই প্রতিফলন।

কেরালা রাজ্য জুড়ে দলের সংগঠন বিস্তারে কমরেড ভেনুগোপাল সর্বদাই কমরেড সি কে লুকোসের পাশে ছিলেন। কর্মীদের গড়ে তোলা এবং বহু মানুষকে দলের সাথে সংযুক্ত করার ক্ষেত্রে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। রাজ্যে কিশোর কমিউনিস্ট বাহিনী কমসোমল গড়ে তোলার কাজেও তিনি যোগ্যতার পরিচয় দেন। কেরালা রাজ্য কমিটির মালয়ালম ভাষায় প্রকাশিত মুখপত্র 'ইউনিটি'-র সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য হিসাবে দীর্ঘ চার দশক এবং প্রধান সম্পাদক হিসাবে পাঁচ বছর দায়িত্ব পালন করেছেন তিনি। ১৯৯৫-তে জার্মানিতে অনুষ্ঠিত 'বিশ্ব যুব সম্মেলনে' তিনি এআইডিওয়াইও-র প্রতিনিধিত্ব করেন।

জনগণের আন্দোলন সংগঠিত করার কাজে কমরেড ভেনুগোপালের দক্ষতা ছিল অসাধারণ। ২০০২-তে ত্রিকুন্নাপুঝা ও আলাপ্পুঝায় কালো বালি উত্তোলন (ব্ল্যাক স্যান্ড মাইনিং) বিরোধী আন্দোলন, ছাড়াও চেঙ্গারার জমি আন্দোলন, ভিলাপ্পিসালায় বর্জ্য ফেলার জমি বৃদ্ধির বিরুদ্ধে আন্দোলন, মুলামপিল্লিতে এবং অন্যত্র হাইওয়ে নির্মাণের অজুহাতে ক্ষতিপূরণ না দিয়ে উচ্ছেদ করার বিরুদ্ধে আন্দোলন, আলাপ্পুঝা উপকূলে চিংড়ির খোলা ছাড়ানোর শ্রমিকদের নিয়ে 'কেএমএসটিইউ' (কেরালা মালসিয়া সংস্করণ থোজিয়ালি ইউনিয়ন)-এর আন্দোলন ইত্যাদি নানা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছেন।

তিনি ছিলেন 'কেরালা জনকিয়া প্রতিরোধ সমিতি'-র প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। কেরালার নিপীড়িত জনসাধারণের বহু ধরনের দাবি নিয়ে এই সমিতি সংকীর্ণ দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে আন্দোলন গড়ে তুলেছে। বিচারপতি ভি আর কৃষ্ণ আইয়ার, লক্ষ্মী এন মেনন, ডাঃ এন এ করিম সহ রাজ্যের বহু বিশিষ্ট মানুষ এই আন্দোলনে যুক্ত হন। এই সমিতির গড়ে তোলা শিক্ষা বাঁচাও আন্দোলনে তিনি অগ্রণী ভূমিকা নেন। পরবর্তীকালে সরকার গঠিত পাঠক্রম সংস্কার কমিটিতে তিনি সদস্য নির্বাচিত হন। আম্বালাপুঝায় সূর্য হাসপাতালের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা। বিগত চল্লিশ বছর ধরে এলাকার দরিদ্র মৎস্যজীবী মানুষ ও কৃষি শ্রমিকদের কম খরচে চিকিৎসা পরিষেবা দেওয়ার কাজ করে চলেছে এই হাসপাতাল।

গুরুতর রোগের সঙ্গে লড়াই করার সময়েও তাঁর মন ভরে থাকত দলের অগ্রগতি সংক্রান্ত চিন্তায়। কমরেড ভেনুগোপালের মতো আমৃত্যু বিপ্লবীকে প্রকৃত শ্রদ্ধা জ্ঞাপনের জন্য প্রয়োজন তাঁর বিপ্লবী জীবনসংগ্রাম থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা এবং যে বিপ্লবী সংগ্রামের পদ্ধতি তাঁকে এই পর্যায়ের নেতায় উন্নীত করেছিল, তার অনুশীলনে আত্মনিয়োগ করা।

কমরেড ভি ভেনুগোপাল লাল সেলাম

পাঠকের মতামত

প্রকৃত বিরোধী কারা

ভোট রাজনীতিতে প্রকৃত অর্থে বিরোধী কারা? শুধু পতাকার রং আলাদা হলেই আর মুখে বিরোধিতার ঝড় তুললেই কি বিরোধী হয়ে যায়? ভোটসর্বস্ব দলগুলির নেতারা নিজের স্বার্থ পূরণ করবার জন্য অন্য পাঁচটা ব্যবসার মতো রাজনীতিকে কাজে লাগিয়ে কোটি কোটি টাকা আয় করে। আবার প্রয়োজন মতো দল বদলে নেয়, ঠিক যেমন এক ব্যবসা না চললে অন্য ব্যবসা ধরতে হয়। এঁদের একমাত্র লক্ষ্য গদিতে বসে জনগণের সম্পত্তির লুঠপাট চালানো। পুঁজির মালিকদের টাকা এঁরা নিয়ে ভোটে লড়েন, তারপর গদি পেলেই সেই মালিকদের সেবা করতে থাকে। সরকার মালিকদের পক্ষে কোনও বিল আনলে এইসব তথাকথিত বিরোধীরা লোকদেখানো বিরোধিতা করে। জিএসটির কথা ধরুন। কংগ্রেস চালু করতে চাইল, বিজেপি তখন তার ঘোরতর বিরোধী। আবার বিজেপি ক্ষমতায় বসেই চালু করে দিল। আসলে মালিকদের স্বার্থ রক্ষা করবার সময় এরা সব একই নৌকার যাত্রী। এ ক্ষেত্রে মালিকের দরকার হয় একটি শক্তিশালী সরকার, যাতে তাদের সাধের বিলগুলি অনায়াসে পাশ করিয়ে নিতে পারে। তাই স্লোগান ওঠে এবার ৪০০ পার। আদানি গোষ্ঠীর সঙ্গে বিজেপির ঘনিষ্ঠতার বিরোধিতা করে তৃণমূল আবার নিজের রাজ্যেই আদানিকে ডেকে এনে ব্যবসার সুবিধা করে দেয়। সিপিএম দাবি করছে, তারা নির্বাচনী বন্ড থেকে টাকা নেয়নি। ক্ষমতায় থাকাকালীন এবং তারপরেও তারা কর্পোরেটের থেকে নিয়মিত চাঁদা পেয়েছে। আবার যারা বন্ডের টাকা নিয়েছে তাদের সাথে ইন্ডিয়া জোটে দিব্যি আছে। টাটাদের সুবিধা দেওয়ার জন্য সিঙ্গুরে অনেক কাণ্ড ঘটিয়েছেন তাঁরা। গোয়েঙ্কাকে সিইএসসি বিক্রি করে দিয়েছে জলের দরে তাঁরাই।

এক কথায়, এই দলগুলি সবাই মালিকের পক্ষে। বিরোধী একমাত্র জনগণ। কারণ ভোটে জেতে এই সব নেতারা, মানুষ প্রতিবারই হারে। তাই কোন দল কটা সিট পাবে এটা ভেবে আমাদের মাথা ভার করে লাভ কী? আমরা ভোট দিই মন্দির-মসজিদ তৈরি করে দেওয়ার জন্য নয়, আমাদের ট্যাক্সের টাকায় আমাদের জীবন সুন্দর করবার জন্য, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, কাজের ব্যবস্থা সুনিশ্চিত করবার জন্য। তাই নেতারা ভোট চাইতে এলে এই প্রশ্ন তাঁরা মানুষের ন্যূনতম প্রয়োজনগুলি মেটানোর ব্যাপারে কী পদক্ষেপ নিচ্ছেন।

গৌতম দাস, মালদা

* * *

আশ্চর্য মায়াজাল

ভোটের পর জনপ্রতিনিধির দেখা না পাওয়ার অভিযোগ যতই উঠুক, ভোট মরশুমে সকাল থেকে রাত পর্যন্ত সকলে কি পরিশ্রমটাই না করছেন! সকলেই চাইছেন যত দ্রুত সম্ভব যত বেশি সংখ্যক মানুষের কাছে পৌঁছাতে। কেউ রাস্তায় মাইলের পর মাইল হাঁটছেন, কেউ মন্দিরে পুজো দিচ্ছেন তো কেউ মসজিদে, দরগায় মাথা ঠুকছেন। কেউ দলিত আদিবাসী বাড়িতে গিয়ে মধ্যাহ্নভোজন সারছেন, কেউ কীর্তনের তালে নাচছেন, আবার কেউ গান ধরছেন। সকলেই চাইছেন ছলে বলে কৌশলে ভোট বৈতরণী পার হতে।

দেশের শাসক শ্রেণি এবং তাদের তল্পিবাহক গণমাধ্যমগুলো যাদের জনপ্রতিনিধি সাজিয়ে দেশের জনগণের সামনে ভোটপ্রার্থী হিসেবে উপস্থাপন করছে, যথার্থই কি তারা সাধারণ খেটে খাওয়া গরিব চাষি, খেতমজুর, কারখানার শ্রমিক, মুটে-মজুরের প্রতিনিধি? অর্থের অভাবে শিক্ষার সুযোগ থেকে বঞ্চিত ছাত্র-ছাত্রী কিংবা চাকরি না পাওয়া বেকার যুবক-যুবতীর প্রতিনিধি? সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন যন্ত্রণা কি তারা অনুভব করেন?

সম্প্রতি অ্যাসোসিয়েশন অফ ডেমোক্রেটিক রিফর্মস-এর এক তথ্য থেকে জানা যায় ২০১৯-এর লোকসভা ভোটে জয়ী ৫৪২ জন সাংসদের ৪৭৫ জনই কোটিপতি। এদের মধ্যে ২৫ জন এমন সাংসদও আছেন যাদের সম্পদের পরিমাণ ১০০ কোটি বা তার বেশি। যে দেশের ৬০ শতাংশ মানুষের দৈনিক গড় আয় ১৩০ টাকা, ৩০ শতাংশ মানুষের দৈনিক গড় আয় ৮০ টাকা, সেই দেশের ৫৪২ সাংসদের ৪৭৫ জনই কোটিপতি— এর থেকে বড় প্রবঞ্চনা, এর থেকে বড় ট্র্যাজেডি আর কী হতে পারে। যে সাংসদের সম্পত্তির পরিমাণ ১৫ কোটি, ৩০ কোটি, ১০০ কোটি কিংবা তারও বেশি, তিনি কি পারবেন একজন শবর মা, অনাহারে অপুষ্টিতে যার শরীর এতটাই ভেঙে পড়েছে যে নিজের শিশু সন্তানকে স্তন্য পান করাতেও অক্ষম, তার সত্যিকার প্রতিনিধি হয়ে উঠতে? এক অজ্ঞাত পরিচয় ভাগচাষি রহিম মিয়ার প্রতিনিধি হতে, ঋণের দায়ে জর্জরিত হয়ে আত্মহননের পথই যার শেষ অবলম্বন! পারবেন সুন্দরবনের এক প্রত্যন্ত দ্বীপের সেই আশাকর্মীর প্রতিনিধি হতে? পারবেন সেই সিভিক ভলেন্টিয়ারের প্রতিনিধি হতে, বৃদ্ধ বাবা-মায়ের চিকিৎসা খরচ যোগাতে যে ঘন্টার পর ঘন্টা রাস্তায় দাঁড়িয়ে থাকাকেই নিজের পেশা হিসেবে বেছে নিতে বাধ্য হয়েছে? পারবেন বন্ধ হয়ে যাওয়া সেই কারখানার শ্রমিকের প্রতিনিধি হয়ে উঠতে? যার পরিবারের মা-বোনেদের অন্ধকারে ছায়ামূর্তি হয়ে দাঁড়াতে হয় দু'বেলা পেট চালাতে। পারবেন সেই গিগ শ্রমিকদের প্রতিনিধি হতে, যাদের একটা বড় অংশ জোমাটো, স্যুইগি, ফ্লিপকার্ট, অ্যামাজনের অনলাইন ডেলিভারি বয় হিসেবে মাইলের পর মাইল দৌড়ে বেড়াচ্ছে পরিবার প্রতিপালন করতে, যাদের সংখ্যা দেশ জুড়ে কয়েক লক্ষ, তাদের প্রতিনিধি হতে? পারবেন সেই পরিযায়ী শ্রমিকদের প্রতিনিধি হতে, বেঁচে থাকার লড়াইতে টিকে থাকতে যাঁদের পাড়ি দিতে হয় গ্রাম থেকে শহরে, এক জেলা থেকে অন্য জেলায়, ভিন রাজ্যে এমনকি বাইরের দেশে। দেশের অর্থনীতির চাকা গতিশীল রাখতে জীবনের সমস্ত ঝুঁকি নিয়ে যারা দিবারাত্রি কাজ করে চলেছে নির্মাণ শিল্পে, ছোট ছোট কলকারখানায়, পরিবহণ ক্ষেত্রে। যাদের দুর্দশার চিত্র কার্যত অবর্ণনীয়। কোটি কোটি টাকার সম্পত্তির মালিক এই সাংসদরা কি পারবেন দেশের অসংখ্য নিপীড়িত, শোষিত, বঞ্চিত মানুষের যথার্থ প্রতিনিধি হয়ে উঠতে? এক কথায় উত্তর— না। এরপরও শাসকশ্রেণি ও তাদের পেটোয়া গণমাধ্যম সাধারণ জনগণকে সেই পাঠ পড়াবে যাতে করে তাদের মনে হয় অমুক দলকে সরিয়ে তমুক দলকে আনলে, অমুক নেতাকে সরিয়ে তমুক নেতাকে ভোটে জেতালে তাদের সমস্যার সমাধান হবে, অবস্থার পরিবর্তন হবে। গণতন্ত্রের নামে নির্বাচনের নামে এ এক আশ্চর্য মায়াজাল! এই মায়াজাল ছিন্ন করতে চাই রাজনৈতিক সচেতনতা, চাই স্পষ্ট বুঝে নেওয়া, কে সত্যিকারের শোষিত মানুষের প্রতিনিধি। যত দিন তা ধরতে বুঝতে না পারা যাবে, ততদিন গণতন্ত্রের নামে শোষিত মানুষের শত্রু যারা, তারাই বারে বারে জয়ী হবে।

জিশু সামন্ত, বাঁশদ্রোণী, কলকাতা-৪৭

* * *

পুলিশি রাজ আনছে বিজেপি

ভারতীয় ন্যায় সংহিতা, ভারতীয় দণ্ডসংহিতা ও ভারতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম— ভারতীয় দণ্ডবিধি, ফৌজদারি দণ্ডবিধি ও ভারতীয় সাক্ষ্য আইনের পরিবর্তে যথাক্রমে ওই তিনটি আইন চালু হবে ১ জুলাই থেকে। এগুলি ফের খতিয়ে দেখতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহকে চিঠি লিখলেন আইনজীবীদের সংগঠন দিল্লি বার কাউন্সিলের সহ-সভাপতি, সম্পাদক ও দুই সদস্য। চিঠির প্রতিলিপি পাঠানো হয়েছে প্রধান বিচারপতি ডি ওয়াই চন্দ্রচূড়কেও। চিঠিতে স্বাক্ষরকারী আইনজীবীদের মতে, এই তিন আইনে পুলিশরাজ চালু হতে পারে দেশে। বিজেপি সরকার সংসদে কোনও আলোচনার সুযোগ না দিয়ে এগুলি পাশ করিয়েছে।

দিল্লি বার কাউন্সিলের সদস্যদের তরফে জানানো হয়েছে, দীর্ঘদিন ধরেই পুলিশি ব্যবস্থায় সংস্কারের প্রয়োজন ছিল। স্বচ্ছ ও উপযুক্ত তদন্তের উপরে বারবার জোর দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট। এই বিষয়ে অটলবিহারী বাজপেয়ীর জমানায় বিস্তারিত সুপারিশ করেছিল মালিমাথ কমিটি। নরেন্দ্র মোদি সরকার সেই সুপারিশের বিষয়গুলি মাথায় রেখে বৃহত্তর জনস্বার্থে আইন সংশোধন করবে বলে আশা করেছিলেন আইনজীবীরা। কিন্তু উল্টে নয়া আইনগুলি হয়েছে দমনমূলক।

দেখা গেল, নয়া আইনে পুলিশ হেফাজতের মেয়াদ ১৫ দিন থেকে বাড়িয়ে ৯০ বা ৬০ দিন করা হয়েছে। ফলে হেফাজতে অত্যাচার ও হেনস্থা করার জন্য ৪ বা ৬ গুণ বেশি সময় পাবে পুলিশ। পাশাপাশি হেফাজতের মেয়াদ বাড়ানো হলে সেই সময়কালে অভিযুক্তেরা জামিনও পাবেন না। বদলাবে পুলিশের দৃষ্টিভঙ্গি। হেফাজতে অত্যাচার ও হেনস্থা রুখতে আদালতের তৈরি ব্যবস্থা কাজ করবে না।

আইনজীবীরা আরও প্রশ্ন তুলেছেন হাতকড়ার ব্যবহার নিয়ে। নয়া আইনে কয়েকটি মামলার ক্ষেত্রে অভিযুক্তকে হাতকড়া পরানোর অনুমতি দেওয়া হয়েছে। কিন্তু একাধিক মামলায় হাতকড়া পরানোকে অমানবিক ও সংবিধান-বিরোধী অ্যাখ্যা দিয়েছিল আদালত। পুরনো আইনে একা বন্দি রাখার ব্যবস্থাকে 'বর্বর' ও 'অসভ্য' অ্যাখ্যা দিয়েছিল সুপ্রিম কোর্ট। কিন্তু নয়া আইনে সেই ব্যবস্থা রাখা হয়েছে, যা আইনজীবীদের মতে সংবিধান-বিরোধী।

কয়েকটি লঘু অপরাধের ক্ষেত্রে শাস্তি হিসেবে সামাজিক কাজের (কমিউনিটি সার্ভিস) বিধান রয়েছে নয়া আইনে। কিন্তু সামাজিক কাজের সংজ্ঞা নয়া আইনে নির্ধারণ করা হয়নি। ফলে কাউকে যদি রাস্তা বা প্রকাশ্য শৌচাগার পরিষ্কার করতে বলা হয় তবে তা মানবিক মর্যাদার বিরোধী বলে মনে করছেন আইনজীবীরা।

সংগঠিত অপরাধ রোধে নয়া আইনে একটি ধারা রাখা হয়েছে। কিন্তু দিল্লি বার কাউন্সিলের সদস্যদের বক্তব্য, এই ধরনের অপরাধের মোকাবিলায় বিশেষ আইন রয়েছে। তাই এই ধারার প্রয়োজন নেই। আবার গণপিটুনিতে খুন রুখতে নতুন আইনে রয়েছে আলাদা ধারা। চিঠিতে আইনজীবীদের প্রশ্ন, হত্যার ক্ষেত্রে আলাদা ধারার প্রয়োজন কী?

নয়া আইনের অন্য একটি ধারায় পাঁচ বা তার চেয়ে বেশি ব্যক্তির জমায়েতকে বেআইনি তকমা দেওয়া হয়েছে। সেই ধারায় পাঁচ বা তার চেয়ে বেশি ব্যক্তির দ্বারা খুনের ক্ষেত্রে আলাদা শাস্তির ব্যবস্থা রয়েছে। আশঙ্কা, এই ধারা ব্যবহার করে শান্তিপূর্ণ সভা-মিছিল বন্ধ করে দিতে পারে প্রশাসন।

জঙ্গি কার্যকলাপ রুখতে তৈরি আইন টাডা ও পোটা বাতিল করতে হয়েছিল। কিন্তু বার কাউন্সিল সদস্যদের মতে, নয়া আইনে ফের সেই আইনে থাকা ক্ষমতা দেওয়া হয়েছে পুলিশকে। বার কাউন্সিল সদস্যদের আরও বক্তব্য, আগের আইনে থাকা রাষ্ট্রদ্রোহের ধারাকে নয়া আইনে আরও কড়া করা হয়েছে। পাশাপাশি নতুন আইনে ভুয়ো বা বিভ্রান্তিকর তথ্য প্রকাশ রোধের জন্য থাকা ধারার প্রবল অপব্যবহারের সম্ভাবনা রয়েছে বলেও মত তাঁদের।

মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড হতে পারে এমন ধারার সংখ্যা বাড়ানো, ফৌজদারি মামলায় ভিডিয়ো কনফারেন্সিংয়ের মাধ্যমে বিচার ও প্রমাণ পেশের ক্ষেত্রেও নয়া আইনের বিধান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন আইনজীবীরা। তাঁদের বক্তব্য, "আইনের শাসনের মূল কথা হল স্বচ্ছ তদন্তের মাধ্যমে বিচার। হেনস্থা নয়। কিন্তু সংশোধিত আইনে সেই বিচারের ক্ষতি হবে সবচেয়ে বেশি। কোনও সভ্য দেশে পুলিশকে এত ক্ষমতা দেওয়া যায় না।"

জ্ঞানতোষ প্রামাণিক
ঘোড়াদল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা

সবচেয়ে বেশি আসনে লড়ছে এস ইউ সি আই-সি

একের পাতার পর

তিনি আরও বলেন, বিরোধীদের বিরুদ্ধে কেন্দ্রীয় এজেন্সিকে ব্যবহারের ধারা সৃষ্টি করার মূল হোতা কংগ্রেস। এই কংগ্রেস '৭৫ সালে জরুরি অবস্থা সহ নানা কালাকানুন জারি করেছে। ভাগলপুর, নেলিতে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, শিখ-গণহত্যার মতো নিকৃষ্ট কাজে এরা যুক্ত ছিল। বাবরি মসজিদের তালা খুলে দিয়ে বর্তমান রাম মন্দির প্রতিষ্ঠার সাম্প্রদায়িক রাজনীতির বীজ বপন রাজীব গান্ধীর উদ্যোগেই ঘটেছিল। এ রাজ্যে '৭২-'৭৭ সালে সিপিআই(এম)-এর দাবি অনুযায়ী তাদের ১১০০ কর্মীকে খুন এবং দমদম-কাশীপুরে গণহত্যা কংগ্রেসই করেছে। এ দেশে ফ্যাসিবাদ কায়েমের শুরু কংগ্রেসের হাত ধরেই। পশ্চিমবঙ্গে কংগ্রেসের ৩০ বছর দীর্ঘ অপশাসনের বিরুদ্ধে এ রাজ্যে বহু রক্তের বিনিময়ে বামপন্থী আন্দোলন গড়ে উঠেছিল। সেই কংগ্রেসের গায়ে 'গণতান্ত্রিক ও ধর্মনিরপেক্ষ' লেবেল লাগিয়ে কেবল কয়েকটি সিটের স্বার্থে সিপিআই(এম) তাদের সঙ্গে জোট করে বামপন্থাকে কালিমালিপ্ত করল। বিজেপি-কংগ্রেস-তৃণমূলের জনবিরোধী রাজনীতিকে পরাস্ত করার জন্য প্রয়োজন ছিল ঐক্যবদ্ধ বামপন্থী আন্দোলন।

সাংবাদিক সম্মেলনে উপস্থিত নেতৃবৃন্দ ঃ বাম দিক থেকে তরুণকান্তি নস্কর, চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য, অমিতাভ চ্যাটার্জী ও সুব্রত গৌড়ী

এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন, গত ৫ এপ্রিল বর্ষীয়ান নেতা কমরেড বিমান বসু সাংবাদিক সম্মেলনে 'ইলেক্টোরাল পলিটিক্সে বামফ্রন্টের সঙ্গে এসইউসি যাবে না' বলে যা বলেছেন তা বিস্ময়কর। এমন কোনও ঘোষিত নীতি আমাদের নেই। এ কথা ঠিক, তিনি আমাকে এই নির্বাচনে একত্রে কিছু করা যায় কি না এই প্রসঙ্গে ফোন করলে আমি যেহেতু নিজে বাইরে ছিলাম তাই পরে আলোচনার কথা বলি। তারপরে কোনও রকম যোগাযোগ ওঁরা করেননি। অথচ তিনি প্রেসের সামনে এমন কথা বলে দিলেন যা তাঁর মতো প্রবীণ নেতার কাছে প্রত্যাশিত ছিল না।

তিনি বলেন, ভোটের বাজারে বিজেপি, কংগ্রেস, তৃণমূলের মতো দলগুলি একে অপরের প্রতি কুকথা বর্ষণের প্রতিযোগিতায় নেমেছে। বামপন্থী রাজনীতির পীঠস্থান এই রাজ্যে অতীতে নির্বাচনের সময় রাজনৈতিক বিতর্কের একটা পরিবেশ থাকত। দিনের পর দিন সেই পরিবেশ কলুষিত হচ্ছিল। কিন্তু এ বছরের নির্বাচনে তা নজিরবিহীন তলানিতে নামল। অন্য দিকে শাসক তৃণমূল প্রশাসনকে ব্যবহার করে নানা কেন্দ্রে ভয়ভীতির পরিবেশ তৈরি করে নির্বাচনকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছে, দিনের পর দিন তা বাড়ছে। নির্বাচন কমিশনের দেওয়া সুষ্ঠু ভোট পরিচালনার প্রতিশ্রুতি ব্যাহত হচ্ছে। আমরা এই বিষয়ে কমিশনের দৃষ্টি আকর্ষণ করছি।

কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য বলেন, বামপন্থার নামে যে ভোটসর্বস্ব সুবিধাবাদী রাজনীতি চলছে সেই 'রিফর্মিস্ট' বামপন্থার বিপরীতে এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট-ই একমাত্র বিপ্লবী বামপন্থার ঝাণ্ডাকে ঊর্ধ্বে তুলে ধরেছে। জনসাধারণ, বিশেষ করে বামপন্থী মনোভাবাপন্ন মানুষের উদ্দেশে তিনি দলের এই বক্তব্য উপলব্ধি করা এবং এস ইউ সি আই কমিউনিস্ট প্রার্থীদের সমর্থন করার আহ্বান জানান।

জিতলে ছাত্রস্বার্থে কী করবেন ?

প্রশ্ন তুলল ছাত্রদের ইস্তাহার

নির্বাচনে ছাত্ররা কী চায় তা ভোটপ্রার্থীদের সামনে স্পষ্টভাবে তুলে ধরতে ছাত্র-ইস্তেহার প্রকাশ করল এআইডিএসও। কলকাতায় সংগঠনের কেন্দ্রীয় অফিসে ১৫ এপ্রিল এই উপলক্ষে আয়োজিত এক সাংবাদিক সম্মেলনে সংগঠনের রাজ্য সম্পাদক কমরেড বিশ্বজিত রায় বলেন, সংসদে এমন প্রার্থীদের পাঠানো উচিত যাঁরা জনগণের প্রকৃত দাবি তুলে ধরবেন।

রাজনৈতিক দলগুলি প্রতিশ্রুতির ম্যানিফেস্টো বা ইস্তাহার প্রকাশ করে থাকে। কিন্তু ভোটাররা ম্যানিফেস্টো প্রকাশ করে সাংসদের কাছে দাবি জানাচ্ছেন— এই চিন্তা অভিনব। এআইডিএসও-র এই চিন্তা আগামী দিনে নানা অংশের মানুষকে সংগঠিত ভাবে দাবি উত্থাপনে উদ্বুদ্ধ করবে।

লোকসভা নির্বাচনে কেন্দ্রে রাজ্যে ক্ষমতাসীন এবং ক্ষমতা প্রত্যাশী ভোটবাজ দলগুলি নানা ভাবে ভোটের অঙ্ক কষছে। তারা দুর্নীতিতে অকণ্ঠ নিমজ্জিত। চলছে দলবদলের সুবিধাবাদী রাজনীতি। অন্যদিকে হারিয়ে যাচ্ছে জনগণের বেঁচে থাকার দাবি। এই পরিস্থিতিতে দেশের লক্ষ লক্ষ ছাত্রের সাথে প্রস্তুতি বৈঠকের মধ্য দিয়ে তুলে আনা হয়েছে সাধারণ ছাত্রছাত্রীদের নিজস্ব ৩১টি দাবি সনদ। যাকে ভিত্তি করে তৈরি হয়েছে এই ছাত্র-ইস্তেহার।

কী আছে তাতে ? দেশের সমস্ত রাজ্যের পাশাপাশি পশ্চিমবঙ্গের সমস্ত বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ এবং বেশিরভাগ ডিগ্রি কলেজে অসংখ্য প্রস্তুতি বৈঠক হয়েছে। যাতে ছাত্রছাত্রীদের মধ্য থেকে স্পষ্টভাবে উঠে এসেছে কেন্দ্রের বিজেপি সরকারের জাতীয় শিক্ষানীতি-২০ এবং রাজ্যের তৃণমূল কংগ্রেস সরকারের রাজ্য শিক্ষানীতি-২৩ বাতিলের দাবি। বস্তুত রাজ্য শিক্ষানীতি '২৩ জাতীয় শিক্ষানীতি '২০-রই কার্বন কপি। এ দুটি বাতিলের পাশাপাশি দাবি উঠে এসেছে স্কুলে-কলেজে সমস্ত শূন্যপদে দুর্নীতিমুক্তভাবে নিয়োগ, উপাচার্যহীন বিশ্ববিদ্যালয়গুলিতে স্থায়ী উপাচার্য নিয়োগ, সমস্ত কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্র সংসদ নির্বাচন করা, এ রাজ্যে বন্ধ হয়ে যাওয়া ৮২০৭টি স্কুল খোলা এবং সমস্ত প্রতিষ্ঠানের পরিকাঠামোগত উন্নয়নের জন্য সরকারি অর্থ বরাদ্দের দাবি। মোট ৩১টি দাবি ম্যানিফেস্টোতে তুলে ধরা হয়েছে। বিশ্বজিত রায় বলেন, নির্বাচনের এই পুরো সময় ধরে এই ইস্তেহার নিয়ে সারা দেশেই কলেজ বিশ্ববিদ্যালগুলিতে প্রচার চালানো হবে। যারা ভোট চাইতে আসবে তাদের কাছে শিক্ষার দাবিগুলো তুলে ধরা, তার ভিত্তিতে দলগুলির শিক্ষা সংক্রান্ত দৃষ্টিভঙ্গি এবং পরিকল্পনা ও শিক্ষার প্রশ্নে তাদের ভূমিকার কথা ছাত্রছাত্রীরা জানতে চাইবে। তাঁর প্রত্যাশা— কেন্দ্র এবং রাজ্য সরকারের শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলন যারা গড়ে তুলছে পশ্চিমবঙ্গের ছাত্রছাত্রীরা সেই গণতান্ত্রিক শক্তির পক্ষে তাঁদের মত ব্যক্ত করবেন।

জীবনাবসান

পুরুলিয়ায় এস ইউ সি আই (সি)-র সাঁওতালডি লোকাল কমিটির সম্পাদক কমরেড মিহির সহিস দীর্ঘ রোগভোগের পর ২৩ মার্চ শেষনিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। বয়স হয়েছিল ৭৩ বছর।

কমরেড মিহির সহিস ছাত্রাবস্থায় এআইডিএসও-র সাথে যুক্ত হন। তিনি ছাত্রদের নানাবিধ ন্যায়সঙ্গত দাবির ভিত্তিতে আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে অত্যন্ত বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন। এই সংগ্রামের ধারাবাহিকতায় তিনি এস ইউ সি আই (সি) দলের বৈপ্লবিক আদর্শ গ্রহণ করে নিজের এলাকার বিভিন্ন গ্রামে সংগঠন গড়ে তোলার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি বহু কর্মীকে সংগঠনে যুক্ত করেছিলেন। নিজের পরিবারের সমস্ত সদস্যকে দলের চিন্তার সাথে যুক্ত করতে পেরেছিলেন তিনি। তাঁর বাড়ির দরজা এলাকার কমরেডদের কাছে সবসময় খোলা ছিল। তিনি জুনিয়র কমরেডদের অত্যন্ত স্নেহ করতেন। এলাকার রাস্তা, পানীয় জল, শিক্ষা সহ নানাবিধ আন্দোলন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে তিনি অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন। সাম্প্রতিককালে পাহাড় ও পরিবেশ রক্ষার দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনে তাঁর ভূমিকা ছিল উল্লেখযোগ্য।

সাঁওতালডি তাপবিদ্যুৎ কেন্দ্র স্থাপনের জন্য জমিদাতাদের পরিবারগুলিকে উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও স্থায়ী চাকরির দাবিতে গড়ে ওঠা আন্দোলনেও কমরেড মিহির সহিস অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। '৮০-র দশকের মাঝামাঝি চাকরিরত অবস্থায় পশ্চিমবাংলার বিদ্যুৎ কর্মীদের সংগঠিত করে পাওয়ারমেন্স ইউনিয়ন গড়ে তোলার অন্যতম উদ্যোক্তা ছিলেন তিনি। পাওয়ারমেন্স ইউনিয়ন ও ঠিকা শ্রমিকদের সংগঠন গড়ে তোলার ক্ষেত্রে বলিষ্ঠ ভূমিকার কারণে তিনি তৎকালীন শাসক গোষ্ঠীর অনুগত ইউনিয়ন এবং প্রশাসনের বিরাগভাজন হয়ে শাস্তিমূলক বদলির শিকার হন। তা সত্ত্বেও তিনি আপস করেননি। দীর্ঘ ৫০ বছরের পার্টি জীবনে দলের প্রতি আনুগত্য ও শৃঙ্খলা রক্ষার প্রশ্নে কমরেড মিহির সহিস দৃষ্টান্ত স্থাপন করে গিয়েছেন।

অসুস্থ অবস্থাতেও তিনি নিয়মিত পার্টি কর্মীদের সম্বন্ধে খবরাখবর নিতেন। মৃত্যুর কয়েকদিন আগে রঘুনাথপুর হাসপাতালে ভর্তি থাকাকালীন তাঁকে দেখতে আসা কমরেডদের তিনি জিজ্ঞাসা করেছিলেন, গ্রাহকদের গণদাবীগুলো ঠিকমতো পৌঁছে দেওয়া হচ্ছে তো?

পার্টি এবং পরিবারের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও তাঁকে বাঁচানো সম্ভব হয়নি। কিন্তু অসুস্থ শরীর নিয়েও তিনি যে দৃষ্টান্ত রেখে গেলেন তা এক কথায় উল্লেখযোগ্য। অসুস্থ অবস্থাতেও প্রায় প্রতিদিনই তিনি পার্টি অফিসে আসতেন। পার্টির কাজে অগ্রাধিকার দিয়ে তিনি অনেক সময় নিজের শরীরের প্রতি প্রয়োজনীয় যত্ন না নিলে কমরেডেরা সমালোচনা করতেন। কিন্তু তিনি কাজ বন্ধ করতেন না। কমরেড মিহির সহিসের মৃত্যু পার্টি এবং শোষিত মানুষের গণআন্দোলনে নিঃসন্দেহে এক ক্ষতি।

তাঁর স্মরণে গত ৭ এপ্রিল পাহাড়িগোড়াতে সভা অনুষ্ঠিত হয়। বক্তা ছিলেন দলের বিশিষ্ট সংগঠক এবং এ আই ইউ টি ইউ সি -র সর্বভারতীয় সম্পাদকমণ্ডলীর সদস্য কমরেড সমর সিনহা। উপস্থিত ছিলেন পুরুলিয়া উত্তর সাংগঠনিক জেলা কমিটির সম্পাদক কমরেড লক্ষ্মীনারায়ণ সিনহা। সভাপতিত্ব করেন দলের প্রবীণ সংগঠক কমরেড শ্রীপতি মাহাত।

কমরেড মিহির সহিস লাল সেলাম

R.N.I. No 5268 / 1960
P.R. No. KOL RMS/138/2022-24
গণদাবী | GANADABI | Volume: 76, No.: 35 | Bengali | Weekly | April 19, 2024 | Kolkata | Price: Rs. 3.00 | ৮

২৪ এপ্রিল

এস ইউ সি আই (সি)-র ৭৭তম প্রতিষ্ঠা দিবসে

জনসভা

ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট হল, বিকাল ৫টা

বক্তা- কমরেড সৌমেন বসু • সভাপতি- কমরেড চণ্ডীদাস ভট্টাচার্য

SUCI (Communist)

তামিলনাড়ুতে বামপন্থার পতাকা নিয়ে

এস ইউ সি আই (সি)-র নজরকাড়া প্রচার

নির্বাচনী প্রচারে তামিলনাড়ুর মাদুরাই বিশেষ নজর কেড়েছে। এখানে বর্তমান সাংসদ সিপিএমের। এবারও তিনি ডিএমকে এবং কংগ্রেসের সমর্থন নিয়ে ওই দলগুলির পতাকা-ফেস্টুন লাগিয়ে ভোট প্রচার করছেন। এই কেন্দ্রে এসইউসিআই(সি) প্রার্থী দিয়েছে। মানুষ দেখে অবাক হচ্ছে যে, বিজেপি ও সিপিএমের বিরুদ্ধে এই পার্টি লাল পতাকা নিয়ে লড়ছে। তারা সাগ্রহে জানতে চাইছে, এস ইউ সি আই (সি) লাল পতাকা নিয়ে সিপিএমের বিরুদ্ধতা করছে কেন? উত্তরে সিপিএম তাদের কর্মীদের বোঝাচ্ছে, এসইউসিআই(সি) বিজেপির বি-টিম, ভোটে ভাগ বসাতে তাদের থেকে টাকা নিয়েছে!

বহু মানুষ এসইউসিআই(সি)-র প্রচারপত্র পড়ছেন। তাঁরা সিপিএমের মিথ্যাচারে না ভুলে বলছেন, বিজেপি এবং কংগ্রেসের বিরুদ্ধে এস ইউ সি আই (সি)-র সমালোচনা যুক্তিপূর্ণ।

মাদুরাই দীর্ঘদিনের বামপন্থী দুর্গ। এখানে বহু বার বামপন্থীরা নির্বাচিত হয়েছেন। এই কেন্দ্রে বিপ্লবী বামপন্থী লাইন নিয়ে এস ইউ সি আই (সি)-র বক্তব্য মানুষকে স্পর্শ করছে। তাঁরা এসইউসিআই(সি)-র প্রচারের সময় আর্থিক সাহায্য করছেন সাধ্যমতো। বহু গুরুত্বপূর্ণ যোগাযোগ পাওয়া যাচ্ছে। তামিলনাড়ুর রাজনৈতিক পরিস্থিতি যুক্ত করে সাধারণ সম্পাদক কমরেড প্রভাস ঘোষের লেখা নির্বাচনী বুকলেট ইতিমধ্যেই কয়েক হাজার কপি বিক্রি হয়েছে। সুসজ্জিত গাড়ি নিয়ে নানা স্থানে ঘুরে জনগণের মধ্যে প্রচারের ঢেউ তুলছেন কর্মীরা। তাঁরা নির্বাচনী লড়াইয়ের মাধ্যমে বিপ্লবী প্রেরণা ও ক্ষুরধার রাজনৈতিক উপলব্ধি অর্জন করে দক্ষ প্রচারক হয়ে উঠছেন।

রাজ্যে রাজ্যে দলের প্রার্থীদের প্রচার

রাজস্থানের জয়পুর সিটি কেন্দ্রে দলের প্রার্থী কমরেড কুলদীপ সিং মনোনয়ন জমা দিতে চলেছেন

বাঙ্গালোর উত্তর কেন্দ্রে প্রার্থী কমরেড হেমাবতী কে-র প্রচার

মুর্শিদাবাদ জেলার জঙ্গিপুর কেন্দ্রের প্রার্থী কমরেড সামিরুদ্দিন-এর দেওয়াল লিখন

দমদমে অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিপূরণ ও পুনর্বাসন দাবি

১৩ এপ্রিল, দমদম ছাতাকল (মেলাবাগান) এলাকায় ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ডে শতাধিক পরিবারের ঘর, গবাদি পশু ও ব্যাপক সম্পত্তি নষ্ট হয়। খবর পাওয়ার সাথে সাথেই দমদম লোকসভা কেন্দ্রের এস ইউ সি আই (সি) প্রার্থী বনমালী পণ্ডা দলের কর্মীদের নিয়ে ঘটনাস্থলে ছুটে যান এবং ক্ষতিগ্রস্ত মানুষদের পাশে দাঁড়ান। তিনি বলেন, দমকল দ্রুততার সাথে কাজ করতে পারলে এতবড় ক্ষতি আটকানো যেত। এই প্রশাসনিক গাফিলতির কারণে সমস্ত পরিবার আজ সহায় সম্বলহীন অবস্থায় দিন কাটাচ্ছেন। তিনি বলেন, দমদমের এই বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড, গার্ডেনরিচে অবৈধভাবে নির্মিত বহুতল বাড়ি ভেঙে পড়ায় স্পষ্ট হল, পশ্চিমবঙ্গের মানুষ নিরাপদে নেই। তিনি ক্ষতিগ্রস্তদের উপযুক্ত ক্ষতিপূরণ ও দ্রুত পুনর্বাসন, অগ্নিকাণ্ডের দ্রুত তদন্তের দাবি জানান। এই দাবিতে ১৫ এপ্রিল দক্ষিণ দমদম পৌরসভায় দলের পক্ষ থেকে ডেপুটেশন দেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ কেন্দ্রে প্রার্থী কমরেড মাহাফুজুল আলমের প্রচার মিছিল হরিহরপাড়ায়

Editor : Amitava Chatterjee   Printed & Published by Amitava Chatterjee on behalf of SUCI (C), West Bengal State Committee from 48 Lenin Sarani, Kolkata 13 ▪ Printed at: Ganadabi Printers and Publishers Pvt. Ltd.   52B Indian Mirror Street, Kolkata-13   Phone: 9433451998, 9432889347   E-mail: ganadabi@gmail.com ▪ Web: https://ganadabi.com